প্রতিবাদ

শক্তিপদ রাজগুরু

সাহিত্য কুটীর
কলিকাতা-৭০০০৮৩

প্রথম প্রকাশ
অক্ষয় তৃতীয়া—১৩৭০

প্রকাশক :
সমীরণ হাওলাদার
সাহিত্য কুটীর
৩৬, ঘোলা রোড
কলিকাতা-৭০০০৮৩

প্রাপ্তিস্থান :
শৈব্যা পুস্তকালয়
৮/১ সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর :
শ্রীমধুমঙ্গল পাঁজা
নিউ সুধীর নারায়ণী প্রেস
১৬, মার্কাস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৭

শ্রীচরণেষু

কাকু ও কাকীমাকে

কমলা স্মৃতি মহিলা সমিতির আশ্রমে দিনের কাজ সুরু হয়েছে। বিরাট পাঁচীল ঘেরা এলাকা, বাগান পুকুর ও রয়েছে, ও দিকে লম্বা টানা বোর্ডিং এর ঘরগুলোয় মেয়েদের ঘুম ভাঙে। ভোর হতেই প্রার্থনার পর সামান্য জলযোগ সেরে মেয়েরা ক্লাশে যায়। কেউ বিভিন্ন হাতের কাযের ক্লাশে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

তাই বিভিন্ন হস্তশিল্পের কায এখানে শেখানো হয়। অনাথ, নিরাশ্রয় মেয়েদেরও ভিড় তাই এখানে।

আশ্রমের অধ্যক্ষ গোপালবাবুর নজর সবদিকে। গোপালবাবুর কলকাতায় একটা ছাপাখানা, সাপ্তাহিক কাগজও আছে। দেশসেবক হৃদয়বান লোক বলেই সে পরিচিত। স্ত্রীর স্মৃতিরক্ষার জন্য এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে এখন জন সাধারণের কাছে আর ও সুনাম কিনেছে। ইদানীং রাজনীতির ক্ষেত্রেও গোপালবাবুর অবদান কম নয়।

সমাজের উপর তলার বহু মানুষ দরাজ হাতে এই প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করে। গোপালবাবু ও প্রতিদিন সকালে আসে এখানে শহর থেকে।

আজ ছুটির দিন। তাই আশ্রমের কঠিন নিয়মগুলোয় কিছুটা শৈথিল্য এসেছে। তাছাড়া আজ তাদের আশ্রমের পিকনিকের আয়োজন করা হয়েছে ডায়মণ্ডহারবারে ও দিকে নদীর ধারে।

সকালেই গাড়িতে বের হবে, তার তোড়জোড় চলেছে। মেয়েরা ও অনেকে যাবে। তাদের নামেরও লিষ্ট হয়ে গেছে।

সকালে গোপালবাবুর গাড়িটা আসে আশ্রমে সকলেই একটু সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

গোপালবাবু কিন্তু সদাহাস্যময় পুরুষ। বেশ সাফসুতরো

চেহারা, মুখে মিষ্টি হাসিটুকু সর্বদাই লেগে আছে। আর সর্বদাই যেন অপরের উপকারের জন্য ভাবিত উৎসর্গীকৃত প্রাণ। গোপাল বাবু শুধোয়—সব আয়োজন হয়েছে শরৎ?

শরৎসুধা আশ্রমের কর্ত্রী। মাঝবয়সী মহিলা। গোপালবাবুর দয়াতেই এখানে এসে ঠাঁই পেয়েছিল অতীতে। আর তার অবদান ও কম নেই। অবশ্য মন্দজনে শরৎসুধা দেবীকে গোপালবাবুর সঙ্গে জড়িয়ে দু চারটে কথা বলে।

গোপালবাবু অবশ্য রাগতে জানে না। জীবনে বহু সাধনায় ক্রোধ নাম রিপুকে সে জয় করেছে।

গোপালবাবু বলে—দেরী করছো কেন? ওদের রওনা করিয়ে দাও। মেয়েরা যেন সাবধানে থাকে। আর সঙ্গে কে যাচ্ছে?

ওপাশে বসেছিল একজন গাট্টাগোট্টা লোক। চোয়ালটা শক্ত গালগুলো ভেঙ্গে গেছে। তবু বেশ কঠিন চেহারা ভূষণের।

ভূষণ বলে—আমি যাচ্ছি স্যার ওদের নিয়ে।

গোপালবাবু বলে ওঠে তাহলে দেরী করিস না। হুঁশিয়ার হয়ে যাবি।

কলরব করে মেয়েরা উঠছে গাড়িতে। বন্দী জীবন থেকে এক-দিনের জন্য মুক্তি পাবে তারা সেই আনন্দে উছল হয়ে উঠেছে।

গোপালবাবু দেখছে ওদের।

শরৎসুধা চুপ করে আছে। অনেক ক্ষেত্রে তাকে চুপকরেই থাকতে হয়। এরপর কি হবে ব্যাপারটা জানে শরৎসুধা। অতীতে কিন্তু এমনি দুএকটা ঘটনা ঘটেছে। আর তাকেই সামাল দিতে হয়েছে।

মফঃস্বলের দূর গ্রাম গ্রামান্তর থেকে অনাথা মেয়েদের ওরা সংগ্রহ করে আনে আশ্রমে, কিছুদিন তাদের এখানে রেখে একটু ভদ্রস্থ করে গোপালবাবু নানা ছলে তাদের বাইরে পাঠায়, তাদের অনেকেই আর ফেরে না। কোথায় যেন পাচার হয়ে যায়।

শরৎসুধা দু'একবার কথাটা বলতে গেছে, কিন্তু গোপাল বাবুর

সুন্দর মুখখানাকে কঠিন হতে দেখেছে ক্ষনিকের জন্য। তারপরই শান্ত কণ্ঠে গোপালবাবু বলে।

—দেখছি খোঁজ খবর করে। বুঝলে শরৎ মেয়েগুলো ও পাজি। দু চারদিন এখানে থেকে ডানা পালক গজায়, তারপর উড়ে যায়। বুঝলেত, দুনিয়াটা বেইমানের ভিড়ে ভরে গেছে।

কিন্তু শরৎসুধা চুপ করে থাকে।

মেয়েদের এই ভাবে গায়ের হয়ে যাবার মধ্যে কোথায় একটা রহস্য রয়ে গেছে, সেটা আজ ও উদ্ধার করতে পারেনি সে।

নদীর বিস্তার এখানে অনেক। শহর থেকে দূরে নির্জন নদীর চরে এসে থেমেছে গাড়িটা মেয়েরা কলরব করে নেমেছে।

ওদিকে একটা ঝাঁকড়া বটগাছ এর নীচে উনুন পেতে রান্নার আয়োজন চলছে।

ভূষণ বলে মেয়েরা এদিক ওদিকে যাবে না।

তবু ওরা দলবেঁধে এদিক ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে খেলা ধূলা দৌড়াদৌড়ি করছে নদীর ধারের ঝাউবনে।

হঠাৎ কাণ্ডটা ঘটে যায়।

একটা লঞ্চ ওই ঝাউবনের নীচে নদীতে কোথায় ওঁৎ পেতে ছিল। একদল মেয়ে ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়েছে। হঠাৎ কয়েকজন লোক তাদের ঘিরে ফেলে গর্জায়।

চেল্লালে খতম করে দেব।

ওদের হাতে রিভলবার, ভোজালি। মেয়েরা চুপ করে গেছে ভয়ে। একজন বলে—ও কটাকে লঞ্চে তোল।

মেয়েরা প্রতিবাদ করতে ওরা ও ভোজালি তোলে।

ওঠ। নাহলে খতম করে দেব।

লোকটা গর্জন করছে। লোকটার তামাটে রং, নাকটা খাড়ার মত ঝুলছে, চোখের নীল চাহনিতে যেন আগুনের জ্বালা করে।

দু তিনজনকে তুলেছে, হঠাৎ আরও ক'জন মেয়ে দূর থেকে ওদের দেখে চীৎকার করে ওঠে—বাঁচাও। ওদের ধরে নিয়ে গেল। বাঁচাও—

ওদের চীৎকারে চমকে ওঠে মেয়েরা। আরও মেয়েরা সমবেত ভাবে ছুটে এসে চিৎকার করছে। দুটো তিনটে জেলে নৌকা ও এসে পড়েছ। ছুটে আসে কয়েকজন লোক।

আর এক দিকে একটা পুলিশের লঞ্চ যাচ্ছিল, তরুণ ইনসপেক্টার অমিত রায় এদিকে এসেছিল একটা কেসের তদন্তে। সমুদ্র থেকে বিদেশী জাহাজগুলো গঙ্গার বুকে এগিয়ে যায়।

গাংএর মধ্যেই ওইসব জাহাজ থেকে নামানো হয় বিশেষ মাল পত্র আর সেই সব বেআইনী মালপত্র নৌকায়, লঞ্চে একটা চক্রের লোক পাচার করে।

অমিত ঘুরছিল নদীর বুকে লঞ্চ নিয়ে যদি তেমন কিছুর হদিশ মেলে।

হঠাৎ সেও তীরের দিকে কাদের চীৎকার, দৌড় ঝাঁপ দেখে চাইল। কয়েকজন মেয়ে চীৎকার করছে।

পেরেরা এই কায এর আগে ও করেছে। একটা ব্যবস্থা, যোগা-যোগ খবরাখবর থাকেই। এর আগে ও বেশ কিছু মেয়েদের নানা ভাবে সংগ্রহ করে অন্যত্র তাদের সুরক্ষিত দেরায় রেখে তাদের জাল পাশপোর্ট কাগজ পত্র সব।

বানিয়ে মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ভালো দামে পাচার করে দেয়। এই অন্ধকারের ব্যবসাটায় পেরেরা একটি যন্ত্র মাত্র। নিখুঁত ভাবে এতদিন সেই কাজ করেছে। কোন গোলমাল হয় নি।

আজ একটু হিসেবে গোলমাল হয়ে গেছে, সঠিক ভাবে আটঘাট বেঁধে না আসার জন্য।

ওদের চীৎকারে লোকজন ছুটে আসে। লঞ্চে কয়েকজন

মেয়েকে তুলেছে বাকী ওই মেয়েদের ফেলে রেখেই পেরেরা বলে —ভাগো জলদি।

ওরা লঞ্চ নিয়ে পালাচ্ছে দূর গাং এর দিকে। তীরে মেয়েরা, লোকজন চীৎকার করছে। অমিত রায় বাইনাকুলার দিয়ে ব্যাপারটা দেখে বলে—একি কাণ্ড? ওরা মেয়েদের নিয়ে পালাচ্ছে। ফলো করো। ওই লঞ্চকে ধরতেই হবে ওদের সারেং!

বিশাল গাং, পেরেরা জানে মুক্ত দরিয়ায় পড়লে এরা চীৎকার করেও আর কিছু করতে পারবে না। ওরা শহরের ওদিকে তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে যাবে।

কিন্তু ভাবতে পারেনি পেরেরা যে পুলিশ ইনস্পেক্টার অমিত রায়কে এই গাং-এ এই সময় দেখতে যাবে।

সেই তরুণ পুলিশ অফিসারকে খুব ভালো করেই চেনে পেরেরা। তারপর চক্রের পেছনে অমিত রায় যেন ছিনে জোকের মত লেগে আছে।

অন্ধকারে তাদের বহু কায কর্মই হয়। জলপথে বিভিন্ন বিদেশী জাহাজ থেকে তাদের প্রচুর মাল পত্র নামে। আগে থেকেই ওদের আসল ডেরায় ওয়ারলেসে কোড মেসেজ আসে।

ওরা ও বিস্তৃত মোহনায়, গাঢ় রাতের অন্ধকারে কখনও দিনের আলোয় সেই সব মাল নামায়। আর বাইরে ও যায় তাদের ডেরা থেকে আফিম, হাসি স গাঁজা। আর ও অনেক কিছু।

কিন্তু ইদানীং ওই অমিত রায় এই বিভাগের স্পেশাল অফিসার হয়ে দিনরাত ঘুরছে, আর তাদের ও হাতে নাতে ধরতে চায়।

ওদিকের গাং এর বুকে জল কেটে পুলিশ লঞ্চটা ছুটে আসছে। মিঃ পোরেরা বলে।

—ফুল স্পিডে গিয়ারে চল। মেয়েগুলোকে সামলে রাখ। পুলিশ লঞ্চ ও ছুটে আসছে। এরা ও পাল্লা দিয়ে ঢেউ এর মাথায় লাফ দিয়ে ছুটে চলেছে কলকাতার দিকে।

কিন্তু পুলিশ লঞ্চটা এগিয়ে আসে। মাইকে অমিত রায়ের গলা শোনা যায়।

গাং এ ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে ওর কণ্ঠস্বর।

—রুখ যাও, নেহি তো গোলি করে গা। রুখ যাও—

পেরেরা দেখছে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। মেয়েদের লঞ্চে তুলে বিপদে পড়েছে। নাহলে তার লঞ্চে কিছুই ছিল না মালপত্র। ধরাই দিত সে।

এখন বিপদে পড়েছে।

দু' একটা ব্ল্যাঙ্ক ফায়ারের শব্দ ওঠে। পুলিশ লঞ্চ থেকে ভয় দেখাবার জন্য শূন্যে গুলি ছুড়ছে। মিঃ পেরেরা লঞ্চে মেয়েরা ও তখন প্রাণ ভয়ে চীৎকার করছে।

মিঃ পেরেরা কর্তব্য স্থির করে নেয়।

এরা লঞ্চ সমেত ধরা পড়লে যে ভাবে হোক এদের বাঁচানো যাবে কিন্তু পুলিশ তাকে ছাড়বে না। পেরেরা দেখছে এদিকে তীরভূমি কাছেই। আর নদীর ধারে বেশ কিছু বন মত রয়েছে। জায়গাটাও নির্জন।

মিঃ পেরেরা বলে লঞ্চ ধারে বেড়াও, আমি নেমে যাচ্ছি। তোমরা পালাবার চেষ্টা করো। তারপর পুলিশ ধরে ধরুক। তখন দেখা যাবে।'

লঞ্চ ধারে ভেড়াও।

সারেং ও এসব ব্যাপারে পটু। সে জানে কর্তা ব্যক্তিদের বাঁচাতেই হবে। তাহলে তারাও বাঁচবে।

স্টিয়ারিং এ মোচড় দিয়ে লঞ্চটাকে নদীর তীরের কাছে আনে এক লহমার জন্যে, পেরেরা ও এই অবকাশে পিছন দিক থেকে লাফ দিয়ে তীরে নেমে বনের মধ্যে ঢুকে যায়। লঞ্চটা যেন তীরে ঠেকে যেতে যেতে রয়ে গেছে, আবার সে গাং বরাবর ছুটে চলে।

পুলিশ লঞ্চটা এবার কাছে এসে পড়েছে। বন্দুক দেখিয়ে গাস কাঠ অমিত রায়—লঞ্চ থামাও!

পরাজিত ওরা।

সারেং লঞ্চ থামাতেই অমিত রায় তার দলবল নিয়ে এদের লঞ্চে লাফ দিয়ে উঠে ওই ক্রন্দনরতা মেয়েদের দেখে অবাক হয়।

—কি ব্যাপার?

মেয়েরা বলে—জোর করে এরা ধরে নিয়ে যাচ্ছিল।

অমিত গর্জে ওঠে। কোথায় যাচ্ছিলে এদের নিয়ে?

সারেং বলে—কিছু জানি না হুজুর। যে সাব লঞ্চ ভাড়া নিয়েছিল তাকে চিনি না।

—সে কোথায় গেল?

—ভেগে গেছে হুজুর। সারেং নিপাট ভালো মানুষের মত জবাব দেয়।

মেয়েদের চুরি করে বাইরে পাঠানো হচ্ছে এ খবর ও আছে পুলিশের কাছে। আজ সেই চক্রের সন্ধানই পেয়েছে এরা। আর লঞ্চে অমিত দেখেছে একজন লোককে। কিন্তু ঠিক চিনতে পারেনি দূর থেকে। টুপি দিয়ে সে মুখ খানাকে ঢেকে রেখেছিল।

তবু অমিত রায় লঞ্চ আর মেয়েদের নিয়ে চলেছে। ওরা কমলা-স্মৃতি মহিলা সমিতির আশ্রমে থাকে। ওখান থেকেই বেশ কিছু মেয়ে হারিয়ে যায় মাঝে মাঝে।

আদালতে কেস দিয়েছে পুলিশ থেকে। খবরের কাগজেও মেয়ের দলকে পাচার করার সময় ধরা হয়েছে তা ফলাও করে বের হয়েছে। কিন্তু পুলিশ সেই চক্রের কোন খবর পায় নি। লঞ্চ-এর মালিক অন্য লোক। আদালতে সে ও এসে জানায় যে সে নিরপরাধ। ভাড়া যারা নিয়েছিল তাদের চেনে না।

পুলিশ মিঃ পেরেরাকেই জড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু মিঃ পেরেরার

উকিল বিজয় সেন বারের নামকরা এডভোকেট, ক্রিমিন্যাল কেসের বাঘ।

তিনি বলেন—পুলিশ তাকে ধরতে ও পারে নি, কোন প্রমাণ ও পায় নি যে পেরেরা এই জঘন্য নারী চালানের ব্যাপারে জড়িত। একজন সৎ নাগরিককে অযথা অকারণে নিছক সন্দেহ করে ধরে আনার ব্যাপারে আমি মহামান্য আদালতের কাছে পুলিশের অকর্মণ্যতার অভিযোগই আনছি। প্রার্থনা করি মিঃ পেরেরাকে এই নোংরা চার্জ থেকে বেকসুর অব্যাহতি দেওয়া হোক।

এসেছে গোপাল বাবু ও।

আদালতে বলে সে—অনাথা মেয়েদের উপর এই জঘন্য আক্রমনের প্রতিবিধান করতে পারে নি পুলিশ। কি করে আশ্রম চালাবো হুজুর? বহু কষ্টে, বহু জনের দানে এদের আশ্রয় দিয়ে রুজি রোজকারের কায শেখাই। এসব কলঙ্ক রটলে এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠান চালাই কি করে?

ওর কণ্ঠে অনাথা মেয়েদের প্রতি দরদ ফুটে ওঠে। আদালতের অনেকেই ওর গুণ মুগ্ধ। তাই জজসাহেব উল্‌টে এই মামলার সঠিক তদন্ত না করার জন্য পুলিশকে নিন্দাবাদ করে মামলা ডিসমিস করে দেন। গোপালবাবুকে অনুরোধ করেন—ওদের নিয়ে যান আশ্রমে।

গোপালবাবু যেন দরদে ফেটে পড়ে বলে সে—কোথায় আর যাবে ওরা হুজুর? আপনি বলছেন নিয়েই যাবো ওদের।

মামলা বাতিল, উল্‌টে পুলিশকেই হুঁশিয়ারি করা হোল। পেরেরাও বুক ফুলিয়ে বের হয়ে আসে।

পরাজিত অমিত রায় দেখছে মিঃ পেরেরাকে। ওর ভুল হয়নি। সেদিন লঞ্চ ওকে ওই টুপিপরা অবস্থাতেই দেখেছিল ঠিকই। কিন্তু ধরতে পারে নি। ধূর্ত লোকটা পালিয়েছিল। একদিন ওকে ঠিক ধরবেই।

বিজয় সেন নামকরা এ্যাডভোকেট। দেখতেও সুপুরুষ, বয়স

এর তুলনায় খ্যাতিটা এসেছে তার অনেক বেশী। উদাত্ত কণ্ঠস্বর, এমনি সুঠাম ব্যক্তিত্ব তাকে দক্ষ আইনজ্ঞ হতে সাহায্য করেছে।

এজলাসের পর বারের ওদিকে তার নিজের চেম্বারে এসে বসেছে। আদালতে যখন থাকে তখন বিজয় অন্য মানুষ। তার ধ্যান জ্ঞান তখন ওই আইনই। আইনের বহু ধারা, উপধারা তারা ব্যাখা, টিকা টিপ্পুনি এসবের উপর তার প্রগাঢ় জ্ঞান। কোন আইনের সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ আসামীকে কি করে নিরাপরাধ প্রমাণিত করতে হবে সে গভীর ধ্যান দিয়ে নিরুপণ করে সাক্ষীদের তীব্র জেরার পর জেরা করে সেই সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে আনে।

আর জজসাহেবকেও সেই পথেই চলতে হয়। এযেন তার একটা কেন্দ্রীভূত ইচ্ছাশক্তিই সেই কায করে। তার আসামীদের ঠিক বের করে আনে সে। যত বড় অপরাধীই হোক না কেন আইনের চোখে নিরাপরাধ প্রতিপন্ন করে। তাই বিজয়ের খুবই খ্যাতি।

বিজয় মিঃ পেরেরাকে ও আজ অতি সহজেই খালাস করিয়ে আনে। মিঃ পেরেরাকে চেনে বিজয় সেন আগে থেকেই। শহরের বেশ কিছু ব্যবসাদার মিঃ মীরচাঁদানি, জুটমিল, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপতি মিঃ মালহোত্রা, জনপ্রিয় নেতা সমাজসেবী গোপালবাবু আর ও অনেকেই নামকরা ক্লাবে যাতায়াত করে।

বিজয় সেনের সময় নেই।

বৈকালে কোর্টের পর ও বাড়ি ফিরে নিজের লাইব্রেরীতে পরের দিনের কেসগুলোর ব্রিফ নিয়ে বসতে হয়, মক্কেলরা আসে, জুনিয়ারদের নোট দিতে হয়। তাই সাধারণতঃ বিজয় ক্লাবে যেতে পারে না, তবু নামকরা ক্লাবের মেম্বার হয়েছে সে ব্যবসার খাতিরে। নামী দামী লোকদের সেখানে দুর্বলতম মুহূর্তে পাওয়া যায় কাছ থেকে।

বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নানা মালি মামলা ও থাকে, সে সব সহজেই হাতে আসে।

অবশ্য এসব করতে হয়েছিল বিজয়কে তার আইনগত জীবনের

প্রথম দিকে। এখন বিজয় সেনের মামলার অভাব নেই। এখানের সিভিল কোর্ট, জজকোর্ট—হাইকোর্টে তার মামলার শেষ নেই।

মায় পাটনা, এলাহাবাদ—কটক, দিল্লীর হাইকোর্টেও যেতে হয় কেস করতে।

বিজয় এর ভাগ্য এখন তুঙ্গে।

মিঃ পেরেরার বন্ধু মিঃ মালহোত্রাও এসেছিল কোর্টে। তারও কিসব কেস আছে। তার তদ্বিরও করা হবে, পেরেরার বিপদেও এসেছে সে।

এখন বিপদ কেটে যেতে খুশীমনে চেম্বারে এসে মিঃ মালহোত্রা বলে—অনেক ধন্যবাদ মিঃ সেন। জানতাম পেরেরার কেস এর এই ব্যাপারই করবেন।

মিঃ পেরেরাও বলে—সো কাইণ্ড অব ইউ বিজয়বাবু, জানি আপনিই বিপদের সময় আমাদের একমাত্র বন্ধু। মেনি থ্যাঙ্কস।

বিজয় এর সেক্রেটারী গণেশ বাবু অতীব হিসেবী ব্যক্তি। ও জানে বিজয়বাবু মামলার বিষয় নিয়ে ডুবে থাকে, তার সময় নেই। এদিকে নজরও নাই। তাই গণেশবাবু তার এ্যাপয়ন্টমেন্ট এর ফর্দ, মক্কেলদের কাছে পাওনার হিসাব, বিল, চার্জ, মামলার খর্চার সব নিখুঁত হিসাব রাখে সে। এর মধ্যে বিল গুলো এনেছে মিঃ পেরেরার কাছে। হাজার কয়েক টাকার বিল।

পেরেরা ও তখুনিই টাকার বাণ্ডিল বের করে ওসব মিটিয়ে দিয়ে বলে—আজ তাহলে চলি মিঃ সেন।

মিঃ মালহোত্রা উঠে পড়ে

—চলি, আবার এখানের ফ্যাক্টরীর কেস দুটো আছে, আর এলাহাবাদ হাইকোর্টে কেস

গণেশবাবু ডাইরী বের করেছে।

বলে সে—হ্যাঁ ওসব ঠিক আছে স্যার।

মিঃ মালহোত্রা শোনায় জানি ইউ আর ভেরি পারটিকুলার।

চলি বিজয়বাবু। নমস্কার। আপনার উপরই আমাদের বিষয় আশয়ের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত আছি।

ওদের বিদায় করে বিজয় এবার অন্য কেস নিয়ে নিয়ে পড়েছে। অন্য কোর্টে তার মক্কেলদের মামলা চলছে। দুজন জুনিয়ার ল' পয়েন্টের ব্যাখ্যা করাতে এসেছে ওর কাছে, সাক্ষীকে কোন পয়েন্টে জেরা করবে তারই তালিম দিচ্ছে বিজয় বাবু এমন সময় ইনস্পেক্টার অমিত রায়কে তার চেম্বারে ঢুকে চেয়ার টেনে বসতে দেখে চাইল।

তার জুনিয়ারদের বিদায় করে বিজয় এবার একটু সহজভাবে বলে—কি ব্যাপার অমিত?

অমিত বিজয়ের ছেলেবেলার ইস্কুলের বন্ধু। দুজনে একসঙ্গে স্কুলে পড়েছে, স্কুল থেকে কলেজে এসে তাদের পরিচয় বন্ধুত্ব পরিণত হয়েছিল। বিজয় এম-এ পাশ করে আইন পড়তে গেল, অমিত সেবার আই-পি-এস পরীক্ষা দিয়ে চাকরীতে ঢোকে।

আজও সেই পরিচয়টা নিবিড়ই রয়েছে দুজনের মধ্যে। আর ভাগ্যক্রমে দুই বন্ধু এজলাসে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একজন অপরাধীকে ধরে এনে আইনের চোখে দোষী প্রমাণ করে শাস্তি দেবার চেষ্টা করে

কিন্তু বিজয় তারই প্রতিপক্ষ হয়ে আইনের জটিল গোলক ধাধাঁর মধ্য দিয়ে কোন ধারা উপধারার দোহাই তুলে সেই দোষীকে খালাস করিয়ে দেয়।

আজ ও তাই করেছে।

অমিত বিজয়ের কথায় বলে—ব্যাপারটা তোরই। আজ আবার ব্যাটাকে খালাস করিয়ে দিলি? পেরেরা ই আসল লোক, কাগজে পড়িস নি এখান থেকে কোন চক্র বিদেশে বহু মেয়েকে চড়া দামে বিক্রী করে পাচার করছে।

এসব ওদেরই কায।

বিজয় চেয়ে থাকে। অমিত বলে

—ওই গোপালবাবুর ও ওদের সঙ্গে যোগ সাজস আছে। ওই মহিলা আশ্রম থেকে এর আগেও বেশ কিছু মেয়ে হারিয়ে গেছে। ধরা যায় নি।

আজ ওদের হাতে নাতে ধরে আনলাম। সমাজের এত বড় অন্যায় কারীদের একটা কে, আর তুই কিনা বেকসুর খালাস করিয়ে দিলি ?

বিজয় দেখছে অমিতকে। ছেলেবেলা থেকেই দেখেছে সে অমিতকে! এমনিতে একটু ভাবপ্রবণ। তাই সৎ আর নিষ্ঠাবান পুলিশ অফিসার সে।

বিজয় বলে—আইনের চোখে ঠিকমত সাক্ষৎ, প্রমাণ না থাকলে ওদের সাজা হবেনা।

ঠিক মত সাক্ষী, প্রমান হাজির কর। অমিত বলে কিন্তু এই লোকটাই এসবের পাণ্ডা! বিজয় শোনায়—মুখে বল্লেই তো হবে না। প্রমাণ চাই।

—চোর কি সাক্ষী প্রমান মজুত রেখে তবে চুরি করতে যায় ? অমিতের কথায় বলে বিজয়—কিন্তু প্রমাণ সাক্ষী ঠিক থাকেই, বের করতে হয়।

—যেখানে তা না থাকে তবু সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। অমিত বলে দৃঢ়কণ্ঠে।

বিজয় শোনায়—তা মানি। কিন্তু আইন তা মানবে না। তাই ওরা খালাস পায়।

অমিত বলে—তোর জন্যই ছাড়া পাচ্ছে ওই ক্রিমিন্যালের দল। তুই ওদের সাহায্য করছিস এই সব অন্যায় কাযে।

বিজয় হাসছে। বন্ধুর কথায় চটে না সে। বিজয় বলে —উকিলদের এই টাই কায। মানুষকে আইনের আশ্রয় দেওয়া। তাতে হয় তো অনেক সময় দোষীরাও খালাস পায় কিন্তু আমাদের দোষ কি বল ? ওদের আইনের আশ্রয়টা আমি না দিলে আর একজন উকিল দেবে।

এটা আমার প্রফেসন্ তাই করতে হয়। অমিত ভাবছে কথাটা বলে বিজয়—খুব চটে গেছিস! এটা—

গণেশবাবু জানে সাহেবের কফি চাই, এর মধ্যে কফি ও এসে গেছে দুজনের জন্য। বিজয় বলে।—নে। কফি খা। পরে ওসব ভাববি। সুমিত এর খবর কি? মীনা ভালো আছে তো রে?

ওদের পারিবারিক আলোচনাই সুরু হয়। এবার দুজনের পেশাগত ঝগড়াটা চাপা পড়ে যায়।

বিজয় বলে—আমি ও ফেড আপ্ হয়ে গেছি অমিত, ওই কেস, মামলা, মাক্কলের ঝামেলা। শোন, ক'দিন আসিস নি তোরা বাড়িতে। লেখা ও বলছিস। আজ তো শনিবার, চলে আয় মীনাকে নিয়ে সন্ধ্যা বেলায়। অনেকদিন আড্ডা দেওয়া হয় নি। জমিয়ে আড্ডা দিয়ে রাতে খেয়ে দেয়ে যাবি।

অমিত চাইল ওর দিকে। বলে সে—আজ আমার ও কোন কায নেই। বিজয় বলে—ব্যস। চলে আয় তাহলে। আর গণেশবাবু, গণেশ বাবু চাইলো। বিজয় বলে।

—আজ কোন মক্কেলকে সন্ধার পর বাড়িতে যেতে বলবেন না,

গণেশ বাবু জানে সাহেবকে। এমনি খেয়ালী মানুষ সে। তবু জানায় কিন্তু মিঃ মীরচাঁদানি ওর একটা ব্রিফ নিয়ে আসবেন।

বিজয় বলে—ওকে বলেদেন সোমবার আসতে! আর আপনারও আজ ছুটি।

গণেশ বাবু এবার খুশি হয়।

সহরের অভিজাত এলাকায় বিজয়ের বাড়িটা ওর বাবাই তৈরী করিয়ে ছিলেন। তখন এ দিকে এত ভিড় ও ছিল না। বড় বড় বাগান পুকুরই ছিল। তেমনি একটা বাগান তখনকার দিনে কিনে বিজয়ের বাবা বাড়িটা তৈরী করিয়ে ছিলেন। বাড়ির পিছনে এখনও সে দিনের দুচারটে উৎকৃষ্ট জাতের আম—লিচু প্রভৃতি ফলের গাছ

ও আছে। আর সামনে বেশ সাজানো বাগান। বিজয় ও বাড়িটাকে সাজিয়ে রেখেছে।

তার স্ত্রী লেখা আর ছোট বোন রেবা দুজনের নজর আছে। বিজয়ের সময় নেই। সে তার কায নিয়ে ব্যস্ত এ বাড়ির পুরোনো কাযের লোক হরিপদ কর্তার আমলের মানুষ। হরিপদই মালীদের তাড়া দিয়ে নানা ফুল গাছ লাগায়। তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে রেবা ও লেখা কায করে। তাই বাড়িটা আজ ও সুন্দর হয়ে আছে।

বিজয় কোর্ট থেকে ফিরে লেখাকে খবরটা দিতে খুশী হয় লেখা। তার ছোট সংসার। তাদের একমাত্র মেয়ে তনুশ্রী স্কুল থেকে এসে বসেছিল মায়ের পাশে, ছোট মেয়েটার সঙ্গী বলতে তেমন কেউ নেই। তার পিসীমণি রেবা ও দার্জিলিং এর কোন কনভেণ্টে পড়ে সেখানের হোষ্টেলে থাকে ছুটিতে বাড়ি এলে তার দিনগুলো ভরে থাকে তনুকে নিয়ে।

এবার রেবাপিসী নাকি ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরবে। ছোট মেয়েটা তার পিসীর ঘরে ফেরার দিন শুনছে।

এমন সময় অমিত বাবু আর মীনাকাকীমা আজ আসছে এ বাড়িতে শুনে খুশী হয় সে

লেখা বলে—হরিদা, আজ ওরাও খাবে। রান্নার মেয়েকে দু'একটা আইটেম করতে বলবো। কিছু ছানা আনিয়ে দাও।

আজ এবাড়িতে যেন ছুটির আমেজ এসেছে।

তনুশ্রী খুশীতে গান গাইছে। অমিত, মীনারা এসেছে বেড়াতে।

লেখা বলে—ক'দিন আসেননি অমিত ঠাকুরপো।

মীনা বলে—আসবে কি? বাড়িতে থাকে কতক্ষণ? দিনরাত চোর ডাকাতের পেছনে ঘুরছে

হাসে লেখা। বলেসে।

—তা সত্যি। দুই বন্ধুই ওরা সমান রে। একজন চোর ডাকাত, জোচ্চোরদের খুঁজে পেতে ধরে আসছেন আর আমাদের উনি এক

পাশে দাঁড়িয়ে জজবাহাদুরকে 'ইওর অনার' বলে হাঁক ডাক করে আইনার ফাঁক ফোকর দিয়ে তাদের সব বের করে দিচ্ছে।

ওদের সময় থাকবে কি করে বলো ?

অমিত বলে—ঠিক বলেছেন বৌদি। বিজয়টা সমাজে এই করে ক্রিমিন্যালদের প্রশ্রয় দিয়ে বসেছে।

লেখা বলে—তাইতো চারিদিকে এইসব কাণ্ড ঘটছে। বিজয় বলে —তোদের ভুলের জন্য। কেস ধরে আইনের ফাঁক বুজিয়ে হাজির কর, দেখবি নির্ঘাৎ জেল হবে তাদের।

...হঠাৎ ফোনটা বেজে ওঠে চায়ের পেয়ালাকে কেন্দ্র করে। এদের তর্ক যেন জমে উঠেছে। ওদিকে ফোনটা বাজছে। তনুশ্রীই ধরেছে ফোনটা—করছে পিসীমণি মা দার্জিলিং থেকে ফোন।

লেখা ফোনটা ধরে। দার্জিলিং থেকে বিজয়ের বোন রেবার ফোন এসেছে। লেখা বলে—পরীক্ষা শেষ হবার কথা গেছে কাল, কবে আসছিস ?

পরীক্ষা হয়ে গেল বাড়ি চলে আয় রেবা, দেরী করিস না। কাল আসছিস ?

রেবা দার্জিলিং থেকে ফোন করছে। আগামী কালই দুপুরে ফ্লাইটে রেবার কলকাতা ফেরার কথা। কিন্তু হঠাৎ সুমিত এসে পড়েছে দার্জিলিং-এ।

সুমিত এম-এ পাশ করে কি একটা কম্পিটেটিভ পরীক্ষাও দিয়েছে। এখনও ফল বের হয়নি। ক'দিন বেড়াতে এসেছে দার্জিলিং-এ।

রেবার সঙ্গে সুমিতের পরিচয় কলকাতাতেই, অমিত রায়ের ছোট ভাই সুমিত।

বাবা মা মারা যান তখন সুমিত ছোট। অমিতই তাকে মানুষ করেছে আর অমিতের স্ত্রী মানাও সুমিতকে তার নিঃশেষ স্নেহ ভালবাসা দিয়ে বড় করেছে।

মীনার ছেলে পুলে নেই। সুমিতই তার সব স্নেহ ভালবাসার দাবীদার।

ওদের পারিবারিক পরিচয়ের সূত্র ধরেই সুমিতও বিজয়দের বাড়িতে আসে যায়। রেবাকেও চেনে।

রেবাও সুমিতকে চেনে। আর ঘনিষ্ঠতাও কিছু ছিল, কিন্তু রেবা খুবই চাপা স্বভাবের মেয়ে। তার বৌদিকে চেনে সে। তাই এ বাড়িতে ওদের ঘনিষ্ঠতার কথা কেউ জানে না। রেবা তাদের এতটুকুও জানতে দেয় নি।

বরং বৌদির সামনে সুমিত সম্পর্কে কিছু এমন বিরুদ্ধ মন্তব্য করে যা লেখারও পছন্দ নয়। বলতো সে।

—সুমিত খুব ভালো ছেলে রে। লেখা পড়ায় খুব ভালো। রেবা জবাব দেয়—ভালো বৌদি। ছাখোগে, টুকলিফাই করে পাশ করেছে।

কিন্তু আড়ালে ওদের পরিচয়টা অন্য। তাই সুমিত বেড়াবার নাম করে রেবার পরীক্ষার পর এখানে এসে হাজির হয়েছে। তাই রেবার কাল ফেরা হবে না। সুমিত বলে—দু চারদিন থেকে যেতে পারো না রেবা?

রেবা কি ভাবছে।

তারপর এসেছে ওদের এক বন্ধুর বাড়ি থেকে কলকাতায় ফোন করতে। রেবা বৌদির গলা শুনে বলে।

—কিন্তু বৌদি, কালকের পরীক্ষাটা আরও চারদিন পিছিয়ে গেছে। আমাদের পরীক্ষা শেষ হচ্ছে শনিবার। আমি ধরো একদিন রেষ্ট নিয়ে পরদিনই দুপুরের ফ্লাইটে যাচ্ছি। কেমন!

লেখার ভাবনা অনেক।

রেবার কথায় বলে—দেরী করে ফিরে অন্যরা তো আগে আসছে সঙ্গীও পাবি না।

আমি, চা খাচ্ছি, মীনা খবরটা শুনে বলে—লেখা, সুমিতটা

দার্জিলিং বেড়াতে গেছে, হিলটা হোটেলে উঠেছে' ওরাতো শুক্রবার ফিরবে জানি, রেবাকে ওই হোটেলে ফোন করে সুমিতের সঙ্গে আসতে বলো।

লেখাও কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে রেবাকে ওই কথা বলতে এদিক থেকে রেবা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে—ওই সুমিত ফুমিতকে লাগবে না বৌদি। ওর অত দাম বাড়িয়ে দরকার নাই। বুঝলে?

আমি এখান থেকে হোটেলের গাড়িতে সোজা বাগডোগরা গিয়ে প্লেনে উঠে ঠিক চলে যাবো। এত ভেবোনা তো।

ফোনটা নামিয়ে রেবা এইবার হাসিতে ফেটে পড়ে। সুমিত ও বসে আছে ওদিকে। শুনেছে সে ও কথা গুলো। সুমিত বলে। —অ! আমার পরিচয় ওইটাই? সুমিত না ফুমিত?

হাসছে রেবা। বলে সে—তোমার দাদা বৌদিও ওখানে হাজির ছিল। মনে হল জোর আড্ডা চলেছে। যদি তোমাকে ধরিয়ে দিতাম ভালো হতো?

সুমিত চমকে ওঠে।

বাড়িতে সেও এসব ব্যাপার আদৌ প্রকাশ করেনি। বলে সুমিত।—ওরে বাব্বা:।

রেবা শোনায়—তাই উভয়ের নিরাপত্তার জন্য ওইসব পরীক্ষা ক্যানসেল হওয়া, তোমার সম্বন্ধে ওইসব মন্তব্য করতে হয়েছিল মশাই। এসব বুঝবেনা তুমি! বুঝলে, ছেলেরা এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ হাবা গোবিন্দ।

সুমিত মাথা নেড়ে বিজ্ঞের মত বলে।

—তা সত্যি। প্রেমে পড়লে ছেলেরা হাবা গোবিন্দ হয়ে যায় আর মেয়েরা হয়ে ওঠে দারুণ সাবধানী চালু পুরিয়া এটা বুঝেছি।

রেবা কৃত্রিম কোনে ধমকে ওঠে—থামবে? ফের ওই সব আজে বাজে কথা। সময় মাত্র তিনটে দিন—

সুমিত বলে—ঠিক বলেছো। সুতরাং দার্জিলিং-এর এই প্যাচ-

পেচে বৃষ্টি আর ঘিঞ্জির মধ্যে না থেকে চলো কোথাও দূরে নির্জনে চলে যাবো দুজনে।

রেবা ও অমনি দূর নির্জনে হারিয়ে যেতে চায়। তাই দুজনে বের হয়েছে তাগদার ওদিকে। সুমিতও খুশী, গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ওরা দুজনে পাহাড়ের গায়ে সাজানো সবুজ চা বাগানের ওদিকে কোন পাহাড়ী ঝোরার ধারে কোন ফুলফোটা পাখী ডাকা জগতে হারিয়ে গেছে।

সঙ্গে কিছু খাবার দাবার নিয়ে গেছে, দিনে লাঞ্চ সেরেছে তাই দিয়ে ছায়াঘন পাহাড়ী ঝোরার ধারে। রেবার মনে খুশীর সুর জাগে। লক্ষভ্রষ্টের মত দুজনে ঘুরছে এদিক ওদিক।

পাথরে পাথরে ঘা খেয়ে ছোট্ট নদীটা ছুটে চলেছে তিস্তার দিকে, সাদা পাথর-বালির ওদিকে ঘনসবুজ অরণ্যসীমা, পাহাড়গুলো উঠে গেছে আকাশে। ওই পাহাড়ের উপরে কোমর ঘেসে চলেছে রাস্তাটা। দু চারটে গাড়ি যাতায়াত করছে। এরা তার বহুদূরে।

রেবা বলে—এমনি করে হারিয়ে যেতে মন চায় সুমিত। সুমিত বলে—কিন্তু এমনি বন পাহাড়ে আমি থাকতে পারবো না বাবা।

রেবা যেন স্বপ্ন দেখে। এমনি কোন ঝর্নার ধারে তারা একটি ছোট্ট ঘর বেঁধেছে সহর থেকে অনেক দূরে। হঠাৎ খেয়াল হয় রেবার গুরু গুরু মেঘের ডাকে।

চমকে ওঠে সুমিত।

পাহাড়ের আড়ালে সূর্য কখন ঢলে পড়েছে, বৈকাল গড়িয়ে দ্রুত গতিতে সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে। আর সেই অন্ধকারকে ঘনতর করে তুলেছে মেঘের দল।

মেঘগুলো এখানে খুবই খেয়ালী।

এই নীল আকাশ আলোয় ঝলমল করছে, দেখতে দেখতে পাহাড় উপচে রাজ্যের জলভরা কালো মেঘ ছেয়ে ফেলে আকাশকে। চারিদিকে নামে ঝড়ের তাণ্ডব। বিজলির ঝলক আর বৃষ্টি। এ বৃষ্টি

টিপ টিপ করে ঝরে না। মুষলধারে নামে বৃষ্টির তোড়। গাছপালা পাহাড় বন সব সেই বৃষ্টির যবনিকায় ঢাকা পড়ে যায়।

আর ঘনিয়ে আসে সন্ধ্যার জমাট অন্ধকার।

সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে নামে হিম হিম ভাব। আবহাওয়া, পরিবেশ একেবারে বদলে যায়।

রেবা এমনি বিষাদের জন্য তৈরী ছিল না।

অন্ধকার আর বৃষ্টির আক্রমণে চমকে ওঠে সে। সুমিত বলে। —চলো, ওদিকে যদি রাস্তার দিকে যাওয়া যায়।

কিন্তু তারও উপায় নেই। সারা পাহাড়ের গায়ে চলা পথ দিয়ে তখন জলস্রোত নামছে, পিছল হয়ে গেছে সেই পথ, দুর্গমও।

ওরা অন্যদিকে ছুটতে থাকে আশ্রয়ের সন্ধানে। এখন একটা আশ্রয়ের দরকার। মেঘের গর্জন পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে। ভয়ে চমকে ওঠে রেবা।

সুমিতকেই জড়িয়ে ধরে। দুজনে ভিজে ভিজে গেছে। হিম হাওয়ায় কাঁপছে তারা।

দূরে গাছ গাছালির ফাঁকে একটা আলোর নিশানা দেখা যায়। আলো মানেই আশ্রয়; সুমিত বলে।

—ওই দিকেই চলো। যদি মাথা গোঁজার ঠাই মেলে। সুমিত রেবার শ্রান্ত ভিজে দেহটাকে টানতে টানতে ওই দি· ·ক্ষ্য করে ছুটে চলেছে।

ধনবাহাদুর গুরুং সরকারী বনবিভাগের টুং বাংলোর চৌকিদার। ধনবাহাদুর অবশ্য নামে চৌকিদার। চৌকিদারীর আসল কাযটা করে ফুলমতি তার দুনম্বর বৌ।

পয়লা নম্বর বৌটা কবে কোন কালে জ্বর বোখার হয়ে মারা যাবার পর ধনবাহাদুর তাদের বস্তির ফুলমতিকে বিয়ে করে। সরকারী নোকরি তার, সুতরাং বিয়েতে ফুলমতির বাবাই উলটে ওকে একটা ভইসা দিয়েছিল।

ধনবাহাদুর বলে—সরকারী বাংলোর আসপাশে রয়েছে, চৌকি-দারের ঘুমটি। ভইষা কাঁহা রাখবে কোন দেখ ভাল করবে!

তাই ওটাকে বিক্রী করে ধনবাহাদুর থুম্বা ওদের দিশী মদ খাবার ব্যবস্থাই করেছিল। মদের উপর ধনবাহাদুরের একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। বৌ পোষার ঝামেলা অনেক, কিন্তু থুম্বার নেশায় ঝামেলা নেই। শুধু পেটে চালান করতে পারলেই ব্যস ; বাজীমাৎ।

কিন্তু ফুলমতি টের পেতে সেদিন চ্যালাকাঠ নিয়ে এইসা তাড়া করেছিল ধনবাহাদুরকে, নেহাৎ না পালালে বোধ হয় তার জান খতরা হয়ে যেতো।

তারপর থেকে ফুলমতিয়াই সেই ভইষাকে এনেছে এই বাংলোর ওদিককার চালায়। দুধ ঘী বিক্রী করে। নিজেই ঝাঁটা হাতে বাংলো পরিষ্কার করে। পর্দা কাচে, সাহেবরা এলে খানা পানায়, চা দেয়। মেয়েটিই সব কায করে আর ধনবাহাদুর খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে গেছে। আর মদ গেলে সন্ধ্যার পর থেকে।

তায় আজ আবার বৃষ্টি নেমেছে। পাহাড়ে বৃষ্টির সঙ্গে শীত ও পড়ে। আবার বৃষ্টি চলেছে, অন্ধকার উল্‌সে বিদ্যুৎ চমকায়, বন পাহাড় সেই আলো আধারিতে আদিম রহস্যময় হয়ে ওঠে। ধন-বাহাদুর ঝলসানো মাংস সহযোগে মদের বোতল নিয়ে বসেছে, আর ফুলমতি ও যথারীতি গালি-গালাজ দিয়ে চলেছে।

—দারু পিতে পিতে মরেগা তুম লোগ্। আউর দারু নাহি দিবে।

ধনবাহাদুরের নেশাটা ঠিক জমেনি। আর একটা বোতল কি করে হাতাবে তারই কথা ভাবছে। এমন সময় ওই ঝড় জলের মধ্যে কাদের হাঁক ডাক শোনা যায়।

—চৌকিদার! চৌকিদার!

ধনবাহাদুর ও ডাকটা শুনেছে। তাদের ঘুমটি থেকে বাংলোয় যেতে গেলে এক ফালি বন বাগান পার হতে হবে। এই বৃষ্টিতে

ভিজতে তার আদৌ ইচ্ছা নেই। নেশাটা সবে গোলাবী হয়ে আসছে সেটাকে বরবাদ করতে রাজী নয় সে।

কিন্তু ওই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ডাকটা শুনেছে ফুলমতি। বলে সে ধনবাহাদুরকে—কোন বোলাতা রে?

ধনবাহাদুর তাচ্ছিল্যভার বলে—যানে দো! বরষার রাতে ঝুট ঝামেলা! ছোড় ও বাত।

ফুলমতিয়া দেখছে লোকটাকে। মদই গিলছে। চাকরীর ভয় এতটুকু নেই। কোন সাহেব সুবা হলে রিপোর্ট করে নোকরী ছুটি করিয়ে দেবে।

ফুলমতি দেখছে। একঝলক বিদ্যুতের আলোয় দেখা যায় কারা বাংলোর বারান্দায় উঠে ডাকাডাকি করছে। ফুলমতি বলে—কোই আয়া। যাও—দেখকে আও। এ্যাই!

ধনবাহাদুর ফুলমতির ধমকেকোন রকমে উঠে ছাতা আর লণ্ঠনটা নিয়ে গজগজ করতে করতে বাইরে এল। ফুলমতি ও কি ভেবে ওই অকর্মন্য মানুষটার পিছুপিছু আসতে থাকে। মদের নেশার ঘোরে লোকটা কাকে কি বলে ফ্যাসাদ বাধাবে। তাই ফুলমতি ও আসছে।

ধনবাহাদুর হ্যারিকেনের আলোয় বৃষ্টিভেজা সুমিত আর রেবাকে দেখে চাইল। ওরা দুজনে কোনরকমে বৃষ্টিতে নেয়ে কাঁপতে কাঁপতে এখানে এসে উঠেছে। ধনবাহাদুর টুরিষ্ট বাবু, অফিসারদের চেনে। তারা গাড়িতে নাহয় জিপে আসে। সুটকেশ মালের বোতল থাকে বেতের বাক্সেটে, এরা সেই ধরণের কেউ নয় দেখে বিরক্ত হয়ে ধনবাহাদুর নেশা ছুটে যাবার ক্ষোভে চাইল।

সুমিত বলে—একটা ঘর খুলে দাও।

ধনবাহাদুর ওদের জরিপ করে এবার চৌকিদারী মেজাজে শুধোয় —বুকিং হ্যায়?

সুমিত জানায়—না। এই ঝড় বৃষ্টির রাতে শহরে ফেরার গাড়িও মিলবে না। একটা রাত এখানে থাকতে দিতে হবে।

ধনবাহাদুর বেশ মেজাজ নিয়ে বলে—কানুন নেহি। বেগর বুকিং রাতমে জাগা নেহি মিলে গা।

রেবা চমকে ওঠে। শীতে কাঁপছে। একটা আশ্রয় ও চাই এই রাতে। ব্যাকুল কণ্ঠে বলে সে।

—দয়া করে একটা রাত থাকতে দাও চৌকিদার সাব, কাল সকালে চলে যাবো।

—নেহি।

রেবা বলে—কি হবে সুমিত?

সুমিত ও বলে—যা লাগে নাও। একটা ঘর—

ধনবাহাদুরের মনে নেশা ছুটে যাবার জ্বালা। সেও গর্জে ওঠে —কানুন নেহি। আপ লোগ্ চলা যাইয়ে।

ফিরছে সে।

ফুলমতি ও ওর পিছু পিছু এসে ওদের দুজনকে ওই বিপন্ন অবস্থায় কাতর ভাবে আশ্রয় চাইতে শুনেছে। হ্যারিকেনের আলো পড়েছে ওদের মুখে। ফুলমতি লোক চেনে। ভদ্রঘরের এরা সত্যিই বিপদে পড়েছে। মনেহয় স্বামী স্ত্রীই।

কিন্তু ধনবাহাদুরের মনে ওসব কর্তব্য বোধ নাই। ও নিষ্ঠুর ভাবে ওদের চলে যেতে বলে ফিরছে। এবার ফুলমতি নিজে আবার অবতীর্ণ হয় স্বকীয় ভঙ্গীতে। ধনবাহাদুরের জামাটা খপ্ করে ধরে বলে।

—আবে কানুণ কা বাচ্চে। চৌকিদার তু না হম্ রে। দে চাভি। নিকাল—.

ধনবাহাদুর ভাবেনি ফুলমতি ও এসে হাজির হবে। এখন তাকে দেখে ধনবাহাদুর বিড় বিড় করে—বুকিং নেহি।

ফুলমতি ধমকে ওঠে—ছোড় তেরা বুকিং। বরষামে ভিজে নয়া দুলহান দুলহা এসেছে, তু ভাগিয়ে দিবি এইসা রাতমে? খোল কামরা, যো হোগা পিছু দেখেগা।

সুমিত, রেবা দেখছে ওই জবরদস্ত আশ্রয় দায়িনীকে। ধনবাহাদুর এবার কিছু পয়সার আশা করে। বলে সে—লেকিন—

গর্জেওঠে ফুলমতি—দে চাভি নেহিতো, তুমকো ঘরমে ঘুসনে নেহি দেগা। নিকাল—

এতবড় ধমকে ধনবাহাদুর চাবি বের করে দিল। ফুলমতি কামরা খুলে আলোটা জ্বেলে বলে।

—বেহুস হয়ে যায় আদমী নয়া সাদীর পর। এই—আও অন্দর। আর ধনবাহাদুর কো পয়সা মৎ দেনা, দারু পিয়ে গা।

আরাম করো। তাদের দিকে চেয়ে দেখে ভিজে গেছে দুজনেই।

ফুলমতি ফায়ার প্লেসে কিছু কাঠ জ্বেলে আগুণ করে বলে।

—হম্ কাপড়া কুছ ভেজতা, বদল করকে শুখা লেও আগ্‌মে।

দুপুরের পর বৈকালে কোন পাহাড়বস্তির দোকানে একটু চা খেয়েছিল মাত্র, খিদেও লেগেছে। সুমিত বলে।

—রাতে খাবার কিছু হবে বহিনজী? যোকুছ মিলেগা—

ফুলমতি দেখছে ওদের দুজনকে। সুন্দর মানিয়েছে তাদের। বৃষ্টিভেজা রেবার মুখখানায় কি কামনায় সলজ্জ আভা ফুটে ওঠে।

ফুলমতি বলে—হাঁ—হাঁ। জরুর মিলেগা। হম্ আভি চায় ভেজতে হে, পিছু খানা আয়ে গা।

ধনবাহাদুর মুখ বোদা করে দাঁড়িয়ে আছে। ভুল করেছে সে। প্রথম চোটে ওদের আশ্রয় দিলে ফুলমতির হাতে আর বকশিষটা যেতো না, নিজেই পেতো। কিছু মদ ও কেনা হতো। কিন্তু তাও হ'লনা। শিকার ফস্‌কে গেছে। মদ ও মিলবে না। উলটে খাটুনিই বাড়লো তার।

গুম হয়ে ছিল সে। ফুলমতি হেঁকে ওঠে।

—চল তু। আভি চা আননে হোগা। হম্ বানাতা হ্যায়।

অনিচ্ছাসত্ত্বে ধনবাহাদুর চললো ফুলমতির পিছু পিছু, কিছু বললেই ঝামেলা আর ও বাড়বে।

কাঁচের জানলা দরজা বন্ধ ঘরে ফায়ার প্লেসের পাইন কাঠের আগুনটা একটা উষ্ণ পরিবেশ রচনা করেছে। সুমিত একটা কম্বল জড়িয়ে বসে সিগ্রেট টানছে। আর রেবা পরেছে একটা ছাপা সস্তা শাড়ি। কম্বল জড়িয়ে আগুনের সামনে বসে উত্তাপটুকুকে উপভোগ করছে।

ফুলমতিয়ার আতিথ্যে কোথাও ত্রুটি নেই।

গরমা চা এর সঙ্গে বিস্কুট ও দিয়েছিল। তার কিছুক্ষণ পর এনেছিল রুটি ডাল আর আলু স্কোয়াসের শব্জী সঙ্গে আচার।

খিদের মুখে তাই অমৃত বোধ হয়।

ফুলমতিয়া নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের খাওয়ার তদারক করে খাওয়া শেষ হলে কম্বল, বালিশ ঠিক ঠাক করে বাসনপত্র নিয়ে গেছে। বলে যায় সে—আভি আরাম করো। সুবে ছ'বাজে বেডটি দেগা। এবার বিশ্রামের পালা।

পাহাড় বনের মধ্যে গাছ গাছালি ঘেরা পরিবেশ, বসতিও কম। বিকাল থেকে বৃষ্টি ঝড় সমানে চলেছে। এখন ঝড়ের মাতন একটু কমলেও বৃষ্টি সমানে চলেছে আর মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ার দাপট এখন ও আছে।

কাঁচের জানলা দিয়ে দেখা যায় বিদ্যুতের ঝিলিক, পাহাড় বনের রীতি এই, বৃষ্টি নামলে আর সহজে থামতে চায় না।

চারিদিকে স্তব্ধতা নেমেছে। শোনা যায় গাছগাছালির বুকে বৃষ্টির সুর। গাছের মাথাগুলো ঝড়ের দাপটে নড়ছে, দাপাদাপি করছে। দিনভোর ঘুরে এবার ওরা ক্লান্ত।

কিন্তু শোবার আগে কথাটা খেয়াল হয় রেবার। শুধোয় সে —এই ঘরে শুতে হবে?

সুমিত সিগ্রেট টানছিল। বলে সে—হ্যাঁ। রেবার কণ্ঠে নীরব

আতঙ্কের সুর। বলে সে—তোমার সঙ্গে ইয়ে এই ঘরে রাত কাটাতে হবে?

খেয়াল হয় সুমিতের। বলে সে—তাই তো! কিন্তু করার কিছু নেই। বেশ দেখেছে সুমিত ওই পাহাড়িয়া বৌটি তাদের স্বামী স্ত্রী বলেই ধরে নিয়ে তবে আশ্রয় দিয়েছে। এখন যদি জানতে পারে তারা আসলে তা নয়, তাহলে সাধারণ পাহাড়িয়া মেয়েটি তখনিই চটে উঠবে। আর ওর মেজাজ ও দেখেছে, হয়তো তাহলে রেগে মেগে বেরই করে দেবে তাদের এই ঘর থেকে। মেয়েটি একরোখা এবং তার স্বামীকে ধমকে তাদের ঠাই দিয়েছে স্বামী স্ত্রী ভেবেই। এখনই ওর ধারণাটা বদলে গেলে বিপদই হবে সেটা বুঝেছে সুমিত। তাই বলে—অন্যঘরের কথা বল্লেই বিপদ হবে। ও আমাদের দুজনকে নোতুন বিয়ে হওয়া বর বউ বলেই ভেবেছে। এখন যদি জানতে পারে, তাহলে হয় তো এই ঘর থেকেই ঝড় বাদলের রাতে আবার পথে বের করে দেবে।

চমকে ওঠে রেবা। ভীত কণ্ঠে বলে।

—তাহলে কি হবে?

সুমিত কি ভেবে একটা কম্বল বালিশ তুলে নিয়ে বলে—আমি বাইরের বারান্দার ওদিকেই রাতটা কাটিয়ে দেব। তুমি দরজা বন্ধ করে ঘরে থাকো।

বন্ধ দরজাটা খুলতেই চমকে ওঠে রেবা। এক ঝলক বিদ্যুতের আভাস ওঠে, গুরু গুরু কাঁপছে মেঘের গর্জন। পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে। ঝড়ের সময়টায় ঘরের মধ্যে বৃষ্টিরধারা এসে ঢোকে আর কন্‌কনে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা হাওয়া যেন হিংস্র জানোয়ারের কামড়ের মত দেহে কামড়ে বসে।

রেবা অবাক হয়।

সুমিত অসহায়ের মত ওই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে চলেছে। বারান্দা দিয়ে বৃষ্টির ঝাপটা আসছে। ভিজে গেছে কাঠের মেঝে। এই বৃষ্টির

রাতে সুমিতকে ওই ভাবে ঘর থেকে বের করে দিতে পারবে না রেবা।

তার সামনে একটা মাত্র পথ খোলা আছে। আজই এখুনি সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাকে। বিপদের মুখে শান্ত ভীরু মেয়েরাও হঠাৎ দুর্জয় সাহসী হয়ে ওঠে। মনের মধ্যে তাদের গুপ্ত কোন শক্তি, সাহস ও জেগে ওঠে।

রেবা ও ইতি কর্তব্য স্থির করে নিয়েছে। বলে সে—শোন।

সুমিত চাইল ওর দিকে। রেবা বলে—বাইরে যেতে হবে না। ভিতরে এসো—

সেকি! সুমিত অবাক হয়। বলে সে।—কিন্তু একঘরে রাত্রি কাটাবে?

রেবা তার মনের সব দুর্বলতা অহেতুক ভয়কেও জয় করেছে কি দৃঢ় আত্মবিশ্বাস দিয়ে। বলে রেবা।

—আমাদের ভালোবাসা এত ঠুন্‌কো নয় সুমিত। আমরা দুজনে দুজনকে বিশ্বাস করি। দুজনের মনের কোন ক্লেদই আমাদের প্রেমকে কলুষিত করে তুলবে না এ বিশ্বাস আছে। তাই বলছি তোমাকে এ ভাবে ঝড়ের রাতে বাইরে যেতে দিতে পারি না। তুমি ও এইখানেই থাকবে ওই পাশের খাটে।

সুমিত দেখছে নোতুন একটি রেবাকে। মেয়েদের এই বিচিত্র তেজস্বিনী দেহটাকে সে এর আগে দেখে নি। রেবাকে আজ তাই ভালো লাগে। বাইরে তখনও ঝড় বৃষ্টি সমানে চলেছে। পাহাড় বনে নেমেছে জমাট অন্ধকার ঢাকা এক আদিম রাত্রি।

বাগডোগরা থেকে প্লেনটা বৈকাল নাগাদ এসে নামে দমদম এয়ারপোর্টে। লেখা আর তনুশ্রী এসেছে রেবাকে নিতে, রেবা এই ফ্লাইটেই ফিরছে।

তনুশ্রীই প্রথমে দেখে তাকে প্লেন থেকে নামতে। 'মা পিসিমণি ওই যে।

লেখাও দেখেছে তাকে। পরে পিছনে ভিড়ের মধ্যে দেখা যায় সুমিতকেও নামতে।

লাউঞ্জে এসে রেবা লেখাকে জড়িয়ে ধরে তনুকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে। ততক্ষণে সুমিত লেখাকে দেখে এগিয়ে আসে। —বৌদি।

লেখা ওকে দেখে বলে—রেবা, সুমিতও এল এই প্লেনে, দেখা হয় নি?

রেবা এখন অন্যরূপে। বৌদির কথায় রেবা তনুশ্রীকে আদর করতে করতে অবজ্ঞাভরা সুরে বলে।

—এত ডেকে ডেকে যার তার সঙ্গে আলাপ করতে পারি না। মালপত্র এসে গেছে, চলো বৌদি।

সুমিতকে বলে লেখা—চলো সুমিত, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাই।

সুমিত মনে মনে একটু অবাক হয়েছে রেবার এই নির্দয় অবস্থা দেখে। কলকাতায় এসেই রেবা যেন একেবারে বদলে গেছে'। সুমিত বলে—আবার কষ্ট করবেন বৌদি? লেখা বলে—কষ্ট কি? ওই পথ দিয়েই তো যাবো। চলো।

সুমিত অগত্যা রেবার একটা সুটকেশও হাতে নিয়ে গাড়ির দিকে চলেছে। রেবা বলে—থাক। ওটা আমিই নিতে পারবো।

অর্থাৎ রেবা যে বৌদির সুমিতের প্রতি এই সৌজন্যে খুশী হয় নি এটা লেখাও দেখেছে।

সুমিতকে নামিয়ে ওরা বাড়ির দিকে চলেছে। লেখা এতক্ষণ চুপ করেই ছিল। এবার বলে—এ তোর অন্যায় রেবা, সুমিতের সম্বন্ধে ওসব কথা না বললেই পারতিস। ওকি ভাববে?

রেবা কঠিন স্বরে বলে—ভাবুক গে!

ওসব প্রসঙ্গ অনায়াসে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে শুধোয় রেবা।
—দাদা কেমন আছে?

লেখা বলে—ওর কথা বলিস না। দিনরাত মামলা আর মামলা। এখানে তো নেই। কেস করতে পাটনা গেছে। কাল ফিরবে। রেবা বলে—দাদাকে এবার দেখছি। এমনি করে কাজ নিয়েই থাকবে?

গণেশ গোঁসাই অতীতে মোক্তারশিপে পাশ করে কোন মফঃস্বল ছোট্ট শহরের আদালতে প্রাকটিশ করতো। কিন্তু বাধা হয়েছিল তার জিবের জড়তা। কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে জিভটা আল টাকরায় 'সেট' হয়ে যায়, তখনই তোতলামি সুরু হয়। আর তোতলামিটা বেশীর ভাগ ঘটে যায় একটু উত্তেজিত হলেই।

তাই নিয়ে আদালতেও হাসাহাসি সুরু হতো। আর শহরের নামী লোকরা বলে—তোতলা মোক্তার। মক্কেলরাও এবার সাবধান হয়ে যায়। ফলে গণেশ গোঁসাই-এর প্রাকটিশও সিকেয় উঠেছিল।

তখনই বিজয় সেন সেই সদরে একটা কেসের ব্যাপারে গিয়েছিল, গণেশ গোঁসাইকে দেখেছিল নথীপত্র ঠিক ঠিক হাজির করতে। আর ল'পয়েন্টে নোট ও রেখেছিল ঠিকমত।

প্রাকটিশ না করতে পারলেও লোকটা আইন বোঝে, দায়িত্বশীল, তাই সেখান থেকে গণেশ গোঁসাইকে এনে নিজের কাছে রেখেছিল বিজয়।

এ বাড়ির ওদিকের ঘরে থাকে গণেশবাবু।

এখানে সে দেখেছে সিটি কোর্টে, হাই কোর্টে দুঁধে ব্যারিষ্টারদের সওয়াল করতে। গণেশ গোঁসাই দেখেছে বিজয় বাবুকেও। দুঁধে লোক, গণেশ গোঁসাই এখনও স্বপ্ন দেখে সে আবার ফিরে গিয়ে তাদের শহরের আদালতে চুটিয়ে প্রাকটিশ করছে।

দরজাটা ভেজানো।

বড় সাহেবও এখন শহরে নেই। গণেশ গোঁসাই সামনের

চেয়ারটাকে মহামান্য জজসাহেব ভেবেনিয়ে একটা কেসের আর্গুমেন্ট করে চলেছে।

—ইয়োর অনার। আমার মক্কেলকে যে অপরাধে অভিযুক্ত কৃ করা হয়েছে, ত্ তার বিপক্ষে প্রতিপক্ষ যা যা প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন আমার মতে তা স্-সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। প-প-প্রথম সাক্ষীর সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত হয়নি যে আমার মক্কেল—

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেছে, ঢুকছে রেবা।

প্রথমে রেবাও থমকে দাঁড়ায় ব্যাপারটা ঠিক তখন ও বুঝতে পারেনি।

তারপর শূন্য চেয়ারের দিকে চেয়ে গণেশবাবুর ওই ভঙ্গী দেখে বলে—ওকি করছিলেন ?

গণেশ ও হকচকিয়ে গেছে রেবাকে দেখে। তারপর বোকার মত হেসে বলে—ইয়ে মানে একটু রিহার্সেল দিচ্ছিলাম। ভাবছি এবার নিজেই প-প—

রেবা হেসে ফেলে। বলে সে—নিজেই প্রাকটিস করবেন ?

ঘাড় নাড়ে গণেশ।

রেবা বলে ত-তাই করবেন। আপনার বড়সাহেব কবে ফিরবেন ? তার খবর নাকি আপনিই জানেন—

…গণেশ সেদিকে খুবই হিসেবী।

—বড় সাহেব !

এদিক ওদিক হাতড়াচ্ছে সে। টেবিলের ড্রয়ার, র‍্যাক। যেন ওখানেই কোথাও বড়সাহেবকে আবিস্কার করা যাবে রেবা ও অবাক-হয়—কি খুঁজছেন ?

—অ্যাই যে। এবার গণেশ ডাইরীটা আবিষ্কার করে।

পাতা উল্‌টে কি দেখে বলে চলেছে।

—কাল এ্যারাইভ্যাল দমদম এয়ারপোর্ট এ্যাট নাইন এ-এম, কেস এ্যাট হাইকোর্ট এ্যাট ইলেভন, এনাদার কেস এ্যাট সিভিল

কোর্ট, বৈকালে ল প্ল্যানিং কমিশনের মিটিং, রিসেপসন ডিনার এ্যাট গ্রাণ্ড হোটেল এ্যাট এইট পি-এম, নেকস্ট ডে ফ্লাইং ফর দিল্লী এ্যাট সিক্স ইনদি মর্ণিং, কেস এ্যাট দিল্লী হাইকোর্ট—মীরচাণ্ডানি ভার্সান রিপাবলিক অব ইণ্ডিয়া—

রেবা ওকে টেপরেকর্ডারের মত গড় গড় করে অনবরত বকে যেতে দেখে বাধা দেয়।

—থামুন থামুন। উঃ এই করছে দাদা। এইবার দেখছি ওকে।

বিজয়ের সময় নেই।

পাটনার কেস সেরে সকালের ফ্লাইটেই দমদমে এসে নামছে। ওর জীবনটা যেন আইন, ক্রিমিন্যাল বস আর ওই উপরতলার মানুষের লোভের সাম্রাজ্য সামলাবার কৈফিয়ৎ দিয়ে ঠাসা। নিজের জন্য সময় কোথাও এতটুকু নেই। এ এক উন্মাদনার জীবনই। মাঝে মাঝে কথাটা ভাবে বিজয়ও। এক বিশেষ অর্থবান শ্রেণীর লোকদের নানা অপরাধের অভিযোগে আদালতে আনা হয়, কিন্তু তাদের প্রচুর টাকা, প্রতিষ্ঠা আছে। সেই ধনীর দল আইনকেও যেন কিনে নিতে পারে তাদের স্বপক্ষে, তাই তাদের সাজা হয় না।

বিজয়ের মত বড় বড় আইনজ্ঞরা কোন সুক্ষ্ম ফাঁকে বের করে আনে, তাদের সমাজের বুকে আবার তাদের প্রতিষ্ঠার বিজয়রথ সমান বেগে চলতে থাকে।

অমিতের কথা ও মনে পড়ে। তার অভিযোগ যে নিরর্থক নয় তা ও জানে বিজয়। এর মূলে রয়ে গেছে সমাজব্যবস্থার মধ্যেই গলদ, আইন গুলোকে তার মনেহয় বহু ছিদ্রযুক্ত আর যারা এনিয়ে গবেষণা করে থাকে তারা সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে হাতিকে ও পার করে দিতে পারে। তাই তারা ধরাছোয়ার বাইরে চলে যায় প্রতি-বারই। এবং বাইরে গিয়ে সেই মানুষগুলো আবার তাদের কায যথারীতি চালাতে থাকে।

বিজয় প্লেন থেকে নেমে ভেবেছিল যথারীতি গণেশ কে দেখবে কিন্তু গণেশবাবুর সঙ্গে নিজের বোন রেবাকে দেখে অবাক হয়।

—তুই! রেবা।

রেবা দাদাকে প্রণাম করে বলে খুব—অবাক হচ্ছো না?

বিজয় বলে—অবাক হবারই কথা। রেবা শোনায়—গণেশবাবুর ডাইরীতে যা দেখলাম তাতে মনে হল বাড়িতে তোমাকে পাবার কোন উপায় নেই। তাই দেখা করার জন্য এয়ারপোর্টেই আসতে হল।

হাসছে বিজয়—এঁ্যা! ঠাট্টা হচ্ছে দাদার সঙ্গে!

রেবা বলে—ওরে বাবা! একে দাদা তার বয়সে বড়। এতবড় এ্যাডভোকেট তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করতে আসবো, এতবড় সাহস!

দাদা বোনকে কাছে টেনে নেয়। হাসছে বিজয়। এমন সময় লাগেজ ক্লিয়ার করে ওদিক থেকে গণেশ গোঁসাই ঘড়ি দেখিয়ে বলে —স স্যার, এ্যাট ইলিভন সাত ন-নম্বর ঘরে মালহোত্রা ভার্সাস ষ্টেট কেস! এ্যাট থ্রি, সিটি সিভিল কোর্টে—

বিজয় ও ঘড়ির দিকে চেয়ে বলে—তাইতো। লেট আস্ রান। চল রেবা। গাড়িতে কথা হবে।

বিজয়ের ও দাঁড়াবার উপায় নেই। সোজা ছুটতে হবে হাইকোর্টে, সেখানে মিঃ মালহোত্রার কেস। বিজয় গাড়িতে উঠে বসেছে। বিজয় ফাইলটা দেখছে। রেবা বলে।

—হোষ্টেল থেকে ছাড়া পেলাম শেষে।

বিজয় তখন কেস ফাইলে ডুবে গেছে। গম্ভীর ভাবে ফাইলে চোখ রেখে প্রশ্ন করে—আসামীর ডেট অব রিলিজ কবে?

রেবা বলে—কালই বলতে পারো। আবারই এপ্রিল নাইনটিন—হাঁ হাঁ করে ওঠে গনেশ গোঁসাই রেবাকে—উহুঁ! আপনার নয়, ওই কেসের আসামীর রি. রি. রিলিজের ডেট জানতে চাইছেন সাহেব? ওটা থার্ড জানুয়ারী নাইনটিন সেভেনটি ফাইভ স্যার!

বিজয় ওটা নোট করে রেবাকে বলে—শেষ কালে তোর কথায় কেসে হেরে যাবো ?

রেবা বলে—আদালতের কেসে হারবে না জিতবে জানি না, কিন্তু বাড়ির আদালতের কেসে আমাকে ছাড়া উপায় হবে না দাদা।

সেখানে তোমার মত এ্যাডভোকেটের পুঁজি কোন কাযে আসবে না।

—কেন ? বাড়িতে আবার কেস ? বিজয় শুধোয়। রেবা বলে —কত কেস যে রয়েছে। অবশ্য বাড়িতে তো তাই ঢুকছোনা। কিন্তু তারপর ডেলিগেশন মিটিং, সন্ধ্যায় ডিনার। তা হোটেলেই উঠছো তাহলে ? কাল সকালে আবার চলে যাচ্ছো দিল্লী ?

বিজয় বলে—হোটেলে কেন উঠবো ?

রেবা গম্ভীর ভাবে বলে—একটা রাতের ব্যাপার তো। বিজয় বোনের কথায় এইবার ক্ষোভটা বুঝতে পেরে বলে—ঠিক আছে বাবা। সন্ধ্যায় বাড়িতেই খাবো, ডিনারের প্রোগ্রাম ক্যানসেল করে দেন গণেশবাবু।

হাইকোর্টে এসে গেছে ওরা। বিজয় বলে—আমি নেমে যাচ্ছি গনেশবাবুকে নিয়ে। ড্রাইভার তোকে বাড়িতে ছেড়ে আসবে।

রেবা বলে—বৈকালে ফিরছো তো ?

বিজয় বলে এমন জব্বর শমন ধরিয়েছিস হাজির না হয়ে পারি। সিধে বাড়ি চলে যাবো বৈকালে। গনেশবাবু মনে করিয়ে দেবেন।

—ইয়েস স্যার। গনেশবাবু ও মাথা নাড়ে। বিজয় দিন সাতেক ভ্রাম্যমান জীবন কাটিয়ে বাড়ি ফিরছে। তখন বড় বাড়ির বাগানে বিকালের সোনারং মুছে মুছে অন্ধকারের আভাষ নামে। পাখীদের কলরব জাগে।

এদিকের গেটে আলো জ্বলছে। বাড়ির বাইরের ঘরে ও আলোর

বাহার। একটা ছোট গেট ও বানানো হয়েছে। বাতি জলে সেখানে স্টিরিও তে সানাই-এর সুর ওঠে। গড়ে উঠেছে উৎসবের পরিবেশ।

গাড়ি থেকে নেমে বিজয় একটু অবাক হয়। একটা কার্ডে লেখা আছে বালব্ দিয়ে—ওয়েলকাম হোম।

বিজয় রেবাকে দেখে বিস্মিত হয়ে শুধোয়—কি ব্যাপার রে? তনুশ্রী ও পিসীমনির কাছেই ছিল, বাবাকে একটু আদর করে সে ছুটছে বাড়ির দোতালায় মাকে খবর দিতে।

দাদার কথায় রেবা বলে—এমনিই। এতদিন পর বাড়ি ফিরছো ভাই, চলোতো—

—দুষ্টু কোথাকার?

রেবার সঙ্গে চলেছে বিজয়। অভ্যাসমত কোর্ট থেকে ফিরে একতলায় লাইব্রেরীর দিকে চলেছে বিজয়, রেবা বাধা দিয়ে বলে।

—উহুঁ। এখন ইউ আর আণ্ডার হোম এ্যারেষ্ট। সোজা জজ সাহেবের এজলাসে যেতে হবে। কাম অন্।

—চল্। বিজয় ও হাসতে হাসতে চলেছে। সিড়ির উপরে একটা বোর্ডে তীর আঁকা—টু বেডরুম। রেবা বলে—পথ চেনতো?

বিজয় শোনায়—আমার বাড়ির জিওগ্রাফি চেনাবি আমায়? রেবা বলে—কতদিন পর ফিরছো কে জানে ভুলে গেছ নাকি? চল—

বিজয় শুধোয়— কি ব্যাপার রে?

লেখাও এসে হাজির হয়েছে।

ওর পরণে দামী শাড়ী। সর্বাঙ্গে ফুলের সাজ, গহনার প্রাচুর্য্য চোখে পড়ে।

বিজয় দেখছে ওকে।

রেবা বলে—আজ তোমাদের বিবাহ বার্ষিকী, এই তুচ্ছ কথাটাও মনে রাখার সময় নেই দাদা? অথচ কার কবে চুরি ডাকাতির মামলা এসব তোমার মনে থাকে?

বিজয় হাসতে থাকে।

রেবা বলে—আমি আসছি। বৌদি, সাজার ব্যবস্থাটা ভালোই রেখো। এমন আসামীকে মাপ্ টাপ্ করোনা বাবু।

হাসছে বিজয়, লেখা।

তাদের সংসারে সুখের স্পর্শ টা এমনি করেই পরস্পরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

রেবা একদিনের মধ্যে ছোট খাটো পার্টির আয়োজনও করেছে। দুচারজন পরিচিত জনকেও ডেকেছে। অমিত-মীনারাও এসেছে।

বিজয়ই শুধোয় লেখাকে।

—সুমিতকে বলোনি ?

লেখা বলে—তোমার বোনই এসব করেছে। তাকে শুধতে সে বলে—সুমিতকে কেন ? রেবা ওকে দেখতে পারে না।

হাসে বিজয়—কেন ? সুমিত সত্যিই ভালো ছেলে।

বিজয়ও কথায় কথায় অমিতকে জিজ্ঞাসা করে সুমিতের খবর। ওরা খেতে বসেছে। রেবা পরিবেশন করছে। বিজয়ের কথায় অমিত বলে

—ওদের পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয়নি। সুমিত ত বলছিল এম-এ পাশ করে বসে আছে, কোথায় বাইরের কোন কলেজে নাকি চান্স পাচ্ছে চলে যাবে।

—তাই নাকি ? লেখা বিস্মিত হয়।

রেবা শুনছে কথাটা। মীনা বলে।

—আমি বাপু ওকে বাইরে যেতে দিতে চাইনা। কলকাতাতেই কিছু করুক।

ফোনটা বেজে ওঠে।

লেখা বলে—উঃ। ওই যন্ত্রটা মানুষের উপকার নয়, ক্ষতিই করেছে। ছাখো কার ডাক পড়লো। ধরোতো হরিদা।

হরিপদও কাছে ছিল, ও ফোনটা ধরে বলে।

—অমিত বাবুর ফোন।

অমিত ফোনটা ধরেছে। পুলিশ কমিশনারের অফিস থেকে ডাকছে ওকে। এখুনি কি জরুরী দরকারে যেতে হবে।

উৎসব মুখর পরিবেশটায় ভাঁটা পড়ে।

লেখা বলে—ঠাকুরপো তুমি কাজেই যাও, মীনা একটু থেকে যাক, আমাদের গাড়ি ওকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

অমিত এর চাকরীতে রাত্রি দিন নেই। বিশেষ করে রাতের অন্ধকারেই ওই নিশাচরে দল সক্রিয় হয়ে ওঠে।

ওদের কাছে খবর এসেছে রাতের অন্ধকারে কোথায় মালপত্র নামার কথা আছে। অমিত ও তাই বের হয়েছে।

রাত্রির গাং, কুয়াশার থেকে আবরণ নদীর বুকে অস্বচ্ছ একটা যবনিকা রচনা করেছে, লঞ্চ চলেছে ইঞ্জিনের শব্দ তুলে, দূর আকাশে রাতের তারাগুলো ঝকমক করে। দু'একটা মাছধরা নৌকা দেখা যায়। দূরে তীরে কোন গ্রামে রাতে কোন মিলের আলো মিটমিট করছে।

গাং এ ঘুরছে তারা। মাষ্টার ল্যাম্পটা জ্বলছে লঞ্চের মাথায়, বাকী সব আলো নেভানো। হঠাৎ দূরে দেখা যায় একটা লঞ্চ এগিয়ে আসছে। এরা সাবধান হয়ে ওঠে।

ওদের খবর আছে কোন জাহাজ থেকে জলপথেই মাল পত্র নামানো হবে। বোধহয় সেই কায সেরে ফিরছে ওরা।

লঞ্চটা কাছে আসতেই এদের লঞ্চের ফ্লাডলাইট জ্বলে ওঠে ওদিকের লঞ্চটার একটা চাঞ্চল্য দেখা যায়।—

—পুলিশ!

মি. মীরচান্দানির জাহাজে মাল ওঠানামানোর ব্যবসা। সেই সঙ্গে ওরা আইনী মাল ছাড়াও বেআইনী মালপত্র অনেকই নামায়।

আজ ফিরছে ওরা বেশ কিছু মাল নিয়ে, রবাটসন্ মীরচান্দানির বিশ্বস্ত কর্মচারী। কঠিন একটা মানুষ। রবার্টকে পেয়ে যায় পুলিশ ফলো করেছে তাদের।

ওরা লঞ্চের স্পিড তুলে পালাতে চায়। অমিত ও টের পেয়েছে। ওরাও ওই লঞ্চকে তাড়া করে চলেছে।

রবার্ট গর্জে ওঠে—ফায়ার! অন্ধকারে লালাভ দীপ্তি নিয়ে দু'একটা বুলেট জ্বলন্ত শিখার মত ছুটে যায় ওদের লঞ্চের দিকে। সারেং ও হকচকিয়ে যায়। অমিত ও এবার গুলি চালায়।

পলাতক লঞ্চটার খোলেই গুলি লেগেছে, ওরা প্রাণপণ চেষ্টায় তীরে এসে লাফ দিয়ে নেমে লঞ্চ ফেলে পালাবার চেষ্টা করতেই অমিতরাও দল বল নিয়ে ওদের দুচার জনকে ধরে ফেলে। আর ওদের দলনেতা রবাটসন্‌কে দেখে অমিত চিনতে পারে।

—তুমি রবার্ট বর্টিস? দু দুবার এর আগে ধরা পড়েছিলে।

রবার্টস্ বলে—আমি লঞ্চে ছিলাম না স্যার। কিছু জানি না—ওকথা পরে বলো। অমিত বলে—ওকে এখন এ্যারেষ্ট করো।

ওদের লঞ্চে উঠে অবাক হয়। লঞ্চের খোলে পলিথিন প্যাকে ভরা দামী বিদেশী জিনিষপত্র ঠাসা রয়েছে। অমিতের রাত্রি জাগরণের পরিশ্রম আজ সার্থক হয়। কয়েক লক্ষ টাকার মাল তারা আটকেছে লোকজন সমেত।

খবরটা সকালেই এসে পড়ে মিঃ মীরচান্দানির কাছে। মিঃ মীরচান্দানি শহরের নামকরা শিল্পপতি। তার দু একটা বড়-ইনজিনিয়ারিং কারখানা, বাইরে কোথায় কাগজের কলের মেজর শেয়ার রয়েছে। এ ছাড়া ওর ব্যবসা জাহাজের মালপত্র তোলানামা করানো।

সেই সঙ্গে অন্ধকারের এই ব্যবসাটা ও করে। হাতেনাতে পুলিশ লঞ্চ ধরেছে এত মালপত্র সমেত তাতে ও কিছু যায় আসে না। কিন্তু রবার্টস্ এর মত লোককে ধরেছে। কান টানলে মাথা আসে। ভয় হয় মীর চান্দানির শেষে আসল খবর না বের হয়।

মীরচান্দানি তাই সকালেই এসেছে মিঃ মালহোত্রার কাছে।

মালহোত্রা ওদের মত ব্যবসায়ীদের অলিখিত সমিতির প্রধান।

মিঃ মালহোত্রা পুরোপুরি সাহেবী কায়দায় চলা ফেরা করে। ওর এখানে কারখানা, কনট্রাকটারি ফার্ম ছাড়াও আছে এক্সপোর্ট ইমপোর্টের ব্যবসা। আর ক্লাবেও খুব জনপ্রিয়। কয়েকবারই গলফ খেলাতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, টেনিস খেলাতে ও পটু।

তাই ব্যবসায়ী সমাজ ছাড়াও মালহোত্রাজী অন্য সমাজে ও সুপরিচিত একটি নাম। খবরের কাগজের রিপোর্টাররাও তার খুব চেনা জানা। কোন কাগজে নাকি ওর শেয়ার ও আছে। সেই সুবাদেই জনদরদী নেতা গোপালবাবুর সঙ্গে ও বেশ দহরম মহরম আছে।

গোপালবাবু ও জানে উপরের তলায় মেলামেশা করা তার নিজের স্বার্থেও প্রয়োজন। তার কাগজে গোপালবাবু ফলাও করে ওদের নানা সৎগুণের কথা লেখে, আর গোপালবাবুকেও মালহোত্রা-দের মত ব্যবসায়ীর প্রয়োজন।

মন্ত্রী, হোমরা চোমরা নেতাদের ধরতে গেলে গোপালবাবুর মত লোককে চাই। যত্রতত্র কোন দেবতাকে বিশেষ প্রণামী দক্ষিনাগুলো দেওয়া নেওয়া করানো হয় গোপালবাবুকে দিয়েই। আরও অন্ধকারে কোন বিশেষ ভেট পাঠাতে হবে বিশেষ জায়গায় তারজন্য গোপালবাবু আছে। তার মহিলা আশ্রম থেকেই রাতের অন্ধকারে দু একটি মেয়েকে ও বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়।

অবশ্য গোপালবাবুও এর জন্য উচিত মূল্য পেয়ে যায়। সুতরাং ওদের স্বার্থ নিবিড় ভাবেই জড়িত। তাই এ ওর বিপদে এগিয়ে আসে সাহায্য করতে। সেখানে এদের সহযোগিতার অভাব হয়না।

গোপালবাবু হালফিল সেই মহিলা সমিতির মেয়েদের জোর করে মঞ্চে তুলে নিয়ে যাবার চার্জ থেকে মুক্ত হয়ে এসেছে মালহোত্রাজীর কাছে।

গোপালবাবুই নিজেকে দোষী মনে করে। কারণ এর আগেও বেশ কয়েকবার কয়েকজন মেয়েকে নিরাপদে পাচার করতে গিয়েছিল,

মালহোত্রাজীও তাদের কেশলে মীরচান্দানীর জাহাজী মালের সঙ্গে বিদেশের বাজারে পাচার করে ভালো বিদেশী ডলার রোজকার করেছে। অবশ্য গোপালবাবুও কিছু পেয়েছিল টাকা।

কিন্তু এই বারের চালানটা পাঠাতে পারেনি।

গোপালবাবু বলে—ওই মেয়ে গুলোও শয়তান মালহোত্রাজী, ওগুলোকে তাড়িয়ে এবার নোতুন ব্যাচ এনেছি। শীঘ্রীরই একটা লট দেব।

মালহোত্রাজী বলে—তাই দেন। অনেকদিন কিছু পাইনি। বাইরের এজেণ্টও চাপ দিচ্ছে।

গোপালবাবু বলে—কিন্তু ওই অমিত বাবু খুব পিছনে লেগেছে মালহোত্রাজী, আশ্রমে তাই এখন সোস্যাল ওয়েল ফেয়ার থেকে প্রায় চেক্ হচ্ছে।

মালহোত্রাজী কি ভাবছে।

তার আমদানী মালের উপরও নজর পড়েছে পুলিশের। অমিত রায়ের জন্য শান্তিতে কাজ করতেও পারছেনা। মালহোত্রাজী বলে। —অমিত রায়কে কোন উপায়ে হাতে আনুন গোপালবাবু।

গোপালবাবু অবশ্য ইতিপূর্বে সেই চেষ্টাও করেছিল, দু'একবার আশ্রমেও এনেছে, কোন এক হোটেলে একবার নিয়ে গিয়ে মদ্যপান করাবার চেষ্টা করেছিল মেয়েছেলের ভেটও দিতে চেয়েছিল। টাকাও।

কিন্তু অমিত রেগে উঠে বলে

—ওসব করে আমাকে খুশী করাতে পারবেন না। সরকার যা মাইনে দেয় তাতে ভালই চলে। ওই টাকায় আমার দরকার নেই। আর আপনাদের ওই অন্ধকারের ব্যবসা গুলো বন্ধ করুন।

গোপালবাবু নিপাট বিনয়ী ভালো মানুষ সেজে যায়।

বলে সে—কি বলছেন স্যার! এমনি একটা পার্টিতে ডেকেছি. ওসব কোন উদ্দেশ্য আমার কেন থাকবে?

অমিত বলে—আমাকে মাপ করুন। পার্টিতে আর থাকার সময় নেই। নমস্কার।

অমিত বেশ রেগেই বের হয়ে গেছল। গোপালবাবুর ভদ্রতার মুখোশ এবার খুলে পড়ে। এবার গর্জে ওঠে সে।

—শালা, খচ্চর কাঁহিকা! সাধু! সাধুগিরি ফলিয়ে দেব ব্যাটার।

অমিতকে হাতে আনতে পারে নি।

আর অমিত রায়ও উঠে পড়ে লেগেছে তাদের পিছনে। চা এসেছে। মিঃ মালহোত্রা বলে—মুস্কিলে ফেলেছে দ্যাট ম্যান্ গোপালবাবু?

গোপালবাবুও ভাবছে তাদের মুক্তির পথ।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে মিঃ মীরচান্দানীকে ঢুকতে দেখে চাইল মিঃ মালহোত্রা।

—কি ব্যাপার মীরচান্দানি?

ক্লান্ত মীরচান্দানি অসহায়ের মত সোফায় বসে বলে।

—সর্বনাশ হো গিয়া মালহোত্রাজী। কালরাতে পুরা লঞ্চ দু'নম্বরী ফরেন মাল সমেত পাকড়ে নিল পুলিশ ইনস্পেক্টার অমিত রায়। পাঁচ সাত লাখ রূপেয়ার মাল, লঞ্চ সবকুছ।

—সেকি। চমকে ওঠে মালহোত্রা।

মীর চান্দানির ওই কারবারের একটা ভালো অংশ সে পায়। তার এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোম্পানির মারফৎ কিছু লেন দেন ও হয় বিদেশে। ওরা সবাই একসূত্রে গাঁথা।

তাই মীর চান্দানির এই খবরে ও চমকে উঠেছে।

পেরেরা চুরুট ফুঁকছিল। সে শুধোয়-কাউকে ধরতে পারেনি তো?

মীর চান্দানি বলে—রবার্টসন্ সামনে ছিল। নেমে পালাচ্ছিল লঞ্চ থেকে, ওকে তাড়াকরে একটা চার্চের মধ্যে ধরে ফেলেছে অমিত রায়।

—মাই গড। পেরেরা ভাবছে বিপদের কথা।

পুলিশ চাপ দিয়ে রবার্টকে নুইয়ে ফেলে কিছু ঘরে বের করলে বিপদ হবে। নানা জায়গায় তাদের ওই সব মালপত্র রাখা থাকে। সে খবর জেনে গেলেও বিপদ। পিছনের এই সব দলনেতারা সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। এসব খবর বের হলে বিপদ হবে। তাই মালহোত্রা বলে।

—কোর্টে যাতে পুলিশ ওকে হাজির করে তাই দেখতে হবে।

আর জামিনে সেইদিনই খালাস করতে হবে, যেন পুলিশ খুব বেশীক্ষণ হাতে না পায় ওকে।

—তা কি করে সম্ভব? মীর চান্দানি ভাবছে কথাটা।

মিঃ মালহোত্রা ফোন তুলেছে, ওদের বিপদে আপদে রক্ষাকর্তা ওই বিজয় বাবুই।

মিঃ মালহোত্রা বলে—ব্যাপারটা গিয়ে বলছেন মিঃ মীরচান্দানি, আজই রবার্টসকে কোর্টে হাজির করে জামিনে খালাস করাতে হবে। হ্যাঁ-যাচ্ছেন এখুনিই। নমস্কার।

মিঃ মালহোত্রা ফোন নামিয়ে বলে।

—মীরচান্দানি বিজয়বাবুর চেম্বারে চলে যাও এখুনিই। টাকার জন্য ভেবনা। যা চায় দেবে। কাজ হাসিল করতেই হবে। রবার্টসকে জামিনে বের করে আনা চাই-ই।

কাগজেও খবরটা বের হয়েছে, পুলিশ প্রচুর বেআইনী জিনিষ আটকেছে। আদালতে ধৃত ব্যক্তিদের ও আনা হয়েছে।

অমিত রায় পাবলিক প্রসিকিউটারকে কেসটা বুঝিয়ে জামিনের বিরোধিতা করতে চায়। ধৃত ব্যক্তিদের ছাড়লে প্রমাণ লোপের আশঙ্কাও রয়েছে সে কথাও বলে।

আসামী পক্ষের উকিল দাঁড়িয়েছে বিজয় সেন।

অমিত আজ ও বিজয়কে এই কেস নিতে দেখে একটু অবাক

হয়। পিছনে নিশ্চয়ই কোন তাবড় ব্যক্তি আছে-নাহলে বিজয় সেনকে এত টাকা দিয়ে দাঁড় করাতো না।

সরকারী উকিল ও আদালতে তার বক্তব্য পেশ করে জানায়—ধৃত ব্যক্তিদের পুলিশ হাজতে রাখা হোক।

মিঃ মীরচান্দানির কর্মচারী মিঃ রবার্টস্। ও ফেসেছে রবার্ট-এর জন্য। বিজয় সেন এজলাসে দাঁড়িয়ে বলে।

পুলিশ যাদের লঞ্চে ধরেছে তাদের সমন্ধে আমার জামিনের দাবী নেই। আমিও চাই প্রকৃত অপরাধীদের সাজা হোক। কিন্তু নিরাপরাধ মিঃ রবার্টস্ এর জামিন আমি প্রার্থনা করছি। মিঃ রবার্টস্কে লঞ্চে ধরা হয়নি, একথা পুলিশ অফিসার মিঃ রায় ও স্বীকার করবেন। তাকে ধরা হয়েছিল চার্চের মধ্যে।

ইওর অনার, মিঃ রবার্টসন্ একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, চার্চের ফাদার ও উপস্থিত আছেন। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করলে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে। মিঃ রবার্টসন সেখানে প্রার্থনা করতে গেছলেন। আর পুলিশ সেখানে গিয়ে নির্দোষ মিঃ রবার্টস্কে এ্যারেষ্ট করে।

সরকারী উকিল বলেন—পুলিশ তাকে লঞ্চ থেকে নামতে দেখেছিল।

—সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ। সে রকম কোন সাক্ষী পুলিশের এখানে নেই।

বিজয় প্রতিবাদ করে।

অমিত দেখছে বিজয়কে। রবার্টস্ মত একজন অপরাধীর জন্য সাক্ষীও তৈরী হয়ে এসেছে। বিজয় বলে।

—ইওর অনার, পুলিশ সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে রবার্টস্কে অপরাধী প্রমাণ করে শাস্তি দেওয়াতে অবশ্যই পারেন। কিন্তু জামিন না দিয়ে এক্ষেত্রে তাকে আটকে রাখার দাবী জানাতে পারেননা। সে রকম কোন কারণ তারা দেখাতে পারেননি। অতএব ইওর অনার। মিঃ রবাটস্ এর জামিন মঞ্জুর করা হোক।

আর তার ওই যুক্তির স্বপক্ষে জজসাহেব জামিন ও মঞ্জুর করে দেন রবার্টস্‌নের।

অমিত আজও অবাক হয়। বিজয় সেন যেন প্রতিজ্ঞা করে এক একটা অপরাধীকে এই ভাবে পুলিশের নাগালের বাইরে পাঠাতে চায়।

অমিত রাগ চেপে বের হয়ে আসে কোনমতে এজলাস থেকে বিজয়ের চেম্বারের দিকে।

বিজয় জানতো অমিত আসবে তার কাছে।

তাই ওকে দেখে বলে—বোস। কফি খা।

বিজয়ের কথায় অমিত টেবিল চাপড়ে গর্জে ওঠে।

কফি খেতে আসিনি। এসব কি করছিস তাই জানতে এলাম রবার্টস্‌ ব্যাটা গুণ্ডা, শয়তান, ক্রিমিন্যাল, ওকে সাধু বানালি, জামিনে বের করে দিলি।

বিজয় বলে—ফাক রেখেছিলি কেন?

—ওর পিছনে কোন মক্কেল আছে তাদের ধরতাম।

—তারা ধরা ছোঁয়ার মধ্যে থাকেনা অমিত।

বিজয়ের কথায় অমিত বলে—দেখবি ওদের ঠিক একদিন হাতে নাতেই ধরবো। সেদিন সেই লোক যেই-ই হোক তাকে ছাড়াতে পারবিনা।

বিজয় ভাবছে কথাটা। বলে সে।

—কিন্তু তারা এসবের অনেক উপরে থাকে। অনেক প্রতিষ্ঠা তাদের।

—তাদের হয়তো অনেক টাকা, অনেক প্রতিষ্ঠা আছে।

তাদের এই পাপ গুলোকে প্রশ্রয় দিয়ে সমাজে অপরাধীর সংখ্যাই বাড়ানো হচ্ছে বিজয়। ওদের লোভ বাড়তে বাড়তে একদিন তোর, আমার ঘরেও সর্বনাশ আনবে। তাই মানুষ

হিসাবেই ওদের এই লোভকে বাধা দেওয়া দরকার। কিন্তু তা না করে তোদের মত আইনজ্ঞরা তাদের প্রশ্রয় দিয়ে তাদের আরও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সমাজের মাথায় বসাচ্ছিস।

বিজয় ও ভেবেছে কথাটা। বলে সে।

—কিন্তু আইন তা মানবে না।

বলে অমিত—মানাতে হবে। দেখবি ওদের একদিন ধরবোই। ওই সমাজের উপরতলার মানুষদের মুখোস আমি খুলে দেব।

"সুমিত নিজের ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত।

কলকাতা ফিরেছিল অনেক আশা স্বপ্ন নিয়ে। বনপাহাড়ের সেই বাংলোর বর্ষামুখর রাত্রি, রেবার সান্নিধ্য তার মনে বিচিত্র একটা সুর এনেছিল।

কিন্তু কলকাতায় ফিরে এয়ারপোর্টেই দেখেছিস সুমিত অন্য এক রেবাকে। ওকে যেন চেনে না।

ক'দিন দেখাও হয়নি রেবার সঙ্গে।

সুমিত ও ভেবেছে যে, যেহেতু সে বেকার, চাকরী বাকরী করে না তাই তাকে রেবাও এড়াতে চায়। সে আর রেবা দার্জিলিং-এ ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছিল সেটা ছিল হয়তো ধনীর মেয়ের, বোনের নিছক খেয়াল মাত্র।

সুমিত ও কদিন ঘুরেছে একটা কাযের সন্ধানে। বৈকালে মাঝে মাঝে নদীর ধারের সবুজ পরিবেশে রেবা আর সুমিত আসতো। সেখানেও যায়নি সুমিত।

তার কাছে বাঁচার লড়াইটা বড় হয়ে উঠেছে।

বৌদি মীনাও দেখেছে সুমিত যেন কি কাজে ব্যস্ত। এর আগে বিজয়দের বাড়িও যেতো, দার্জিলিং থেকে ফিরে সেখানে ও যায় নি সুমিত। বাইরে থেকে ফিরে সন্ধ্যাতেও বের হয় না। নিজের ঘরেই কি পড়াশোনা করে। সুমিতের দরাজ প্রাণ খোলা হাসিও যেন থেমে গেছে।

ব্যাপারটা মীনা কেন অমিতেরও চোখে পড়ে।

মীনা শুধোয়—কি ব্যাপার। তুমি চুপচাপ আছো, দিনভোর বাইরে থাকো, হাসিও নাই মুখে।

সুমিত ব্যাপারটাকে হাল্‌কা করার জন্য বলে।

—জানো না বৌদি। ক্ষুধার রাজ্য পৃথিবী গদ্যময় হয়ে ওঠে। চাকরী, বাকরী নেই। তারই চেষ্টা করছি।

মীনা দেখছে সুমিতকে। বলে সে—তাই নাকি?

সুমিত শোনায়—সমর্থ শিক্ষিত পুরুষ, চাকরী নেই। ভাবা যায়? চাকরী না থাকলে কেউ পোছেও না।

মীনা অবাক হয়—তাই নাকি? খুব কষ্টে আছো তাহলে?

সুমিত বলে—তাই!

সেদিন সন্ধ্যার পর অমিত ফিরেছে অপিস থেকে। মীনা চা এনেছে। সুমিত ঘরে ঢুকে বলে—একটা চাকরী পাচ্ছি দাদা।

মীনা চাইল। বলে সে—হ্যাঁ ওটার জন্য খুব ভাবিত ছিলে দেখছি। তা চাকরীটা হল কোথায় সাহেবের? কি চাকরী গো?

সুমিত বলে—হাজারিবাগের কলেজে প্রফেসারি পাচ্ছি দাদা। ভাবছি চলেই যাবো।

—সেকি! চলে যাবি এখান থেকে? অমিত অবাক হয়। ছোট ভাইকে সে এতদিন ধরে মানুষ করেছে। বাবা মা মারা যাবার পর থেকে কাছ ছাড়া করেনি। দুই ভাই এই ভাবে পরস্পর পরস্পরকে নিয়ে বেঁচেছিল। আজ চাকরী নিয়ে ওকে চলে যাবার কথা বলতে অবাক হয় অমিত।

বলে সে—বাইরে না গেলেই নয়? পরীক্ষার ফল বের হোক, পাশ করলে এখানেই ভালো চাকরী পেয়ে যাবি।

সুমিত যেন কি এক অভিমানে কলকাতা থেকে চলেই যেতে চায়। বলে সে—কিন্তু চুপ চাপ বসে থাকবো তোমার বৌদির ঘাড়ের উপর।

মীনা অভিমান ভরে বলে।

—আমার সংসারে খুব ভিড়, তুমিও খুব বড় বোঝা হয়ে আছো, তাই আমরাও নামাতে পারলে বাঁচি এই ভাবে সুমিত, না? তাহলে বাধা দেবনা—

সুমিত বৌদির কণ্ঠস্বরে বেদনার আভাষ পেয়ে বলে।

—না, না বৌদি। ওসব কথা কেন বলছো?

অমিত বলে—ঠিকই বলেছে। এতদিন পর কি করে এইসব ভাবলি সুমিত? দাদা-বৌদিকে এই ভাবে পর করে দিবি? চাকরী করতে হয় কলকাতাতেই কর। বাইরে যাওয়া তোর হবেনা। তুই ছাড়া আর আমাদের কে আছে বল?

সুমিত ও ভেবেছে কথাটা। তাই এখনও মনঃস্থির করতে পারে নি। বৈকালে ক'দিন পর এসেছে নদীর ধারে। শান্ত পরিবেশ। গাছ-গাছালির সবুজে দিনের শেষ আলো মুছে মুছে আসে।

রেবা ক'দিন ধরেই কথাটা ভেবেছে। বৌদির সামনে সুমিতের সঙ্গে ওই রকম ব্যবহার করতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। কিন্তু সুমিতকে দুঃখ দিতে চায়নি সে।

তাই পরদিনই বৈকালে এসেছে রেবা এই নদীর ধারে। কিন্তু সুমিত আসেনি। একাই নদীর ধারে অপেক্ষা করেছে। সুমিতের পথ চেয়ে থেকেছে বৃথাই রেবা।

রেবার মনে হয় সুমিত হয়তো কাজের চাপে আসতে পারেনি, পরদিন আবার এসেছে রেবা।

কিন্তু সেদিন ও সুমিতকে পায় না। মেয়েদের মনে একটা সহজাত বৃত্তি থাকে ওরা টের পায় অন্যের মনের ভাবটাকে। রেবা সেই সঙ্গে নিজের মনের অতলের ছড়ানো দুর্বলতাটাকে এবার আবিষ্কার করেছে। সুমিতকে সেও ভালোবাসে। নাহলে এই ভাবে

ছুটে আসতো না প্রতিদিন। রেবা এই সত্যটাকে আবিষ্কার করে আজ নিজেই চমকে উঠেছে।

বৌদিকে ও এড়িয়ে চলতে হয় সাবধানে। রেবা আজও এসেছে, অনেক আশা নিয়েই এসেছে সে এখানে। আজ সুমিতকে না পেলে ওদের বাড়িই যাবে। ফোন করতে পারে নি রেবা যদি মীনা বৌদি ধরে ফেলে।

হঠাৎ এদিকে গাছের নীচে সুমিতকে দেখে এগিয়ে যায় রেবা।

—তুমি! সুমিত চাইল।

রেবার মুখ চোখে খুশির আভা জাগে। ওর ব্যাকুলতা পরিণত হয় জমাট অভিমানে। বলে রেবা।

কদিন তোমার দেখা নেই। সুমিত আজ বলে—আমার মত একটা অপদার্থ মানুষের সঙ্গে দেখা না হওয়াই ভালো।

রেবা চাইল। সুমিত বলে আর যাতে দেখা না হয় তাই কলকাতা ছেড়েই চলে যাচ্ছি দূরে।

রেবা চাইল। বলে সে।

—কোথায়?

সুমিত কোথায়—হাজারীবাগে!

রেবা কি ভাবছে। ওর মনে হয় সুমিত যেন তারই উপরে রাগ করে চলে যাচ্ছে।

রেবা বলে—দোষ আমি করেছি সুমিত।

সুমিত চাইল। রেবা বলে—তোমার উপর অবিচারই করেছি। অপমান করেছি। কিন্তু না করে উপায় ছিল না। বৌদি, দাদা সকলের কাছেই এটাকে গোপন রাখতে চেয়েছিলাম, তাই ওই সব কথা বলে তোমাকে যে পছন্দ করি না বাইরে সেটাকে জানতে হয়েছিল। তাই কথাটা তোমাকে বলবার জন্য এখানে প্রতিদিন এসেছি। বিশ্বাস কর।

সুমিত দেখছে রেবাকে। এ আবার অন্য এক রেবা। কি

অনুশোচনায় ওর দুচোখে জল নেমেছে। সেই তেজস্বিনী মূর্তিটা বদলে গেছে। সুমিত নিজেকেই যেন দোষী মনে করে। রেবা বলে। তুমিও আমায় ভুল বুঝে দূরে সরে যাবে সুমিত?

সুমিত এর মনে হয় দাদা বৌদিও তাকে নিষেধ করেছে, আর রেবাও আজ এগিয়ে এসেছে সেই কথা জানাতে। রেবাকে সে ভুলই বুঝেছিল।

এই ভুল ভাঙ্গতে সেও মনে মনে খুশি হয়েছে। তার হারায় নি কিছু। সুমিত বলে—দেখি।

রেবা বলে—দেখার কিছু নেই সুমিত। তুমি যাবে না। এখানেই একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে নিশ্চয়। পরীক্ষাতে পাশ করবেই। এখানেই পোষ্টিং হবে।

সুমিত দেখছে রেবাকে। বলে সে—তাই হবে রেবা। দেখা যাক ভাগ্য কোনদিকে নিয়ে যায়।

সন্ধ্যানামছে গাং এর বুকে। ঘরে ফেরা পাখীদের কলরব শুরু হয়। আকাশের বুকে দু-চারটে করে তারা জাগছে, নদীর বুকে আঁধার ঘনিয়ে আসে। সেই অন্ধকারে দু একটা চলমান আলোক বিন্দু হয়ে নৌকাগুলো হারিয়ে যায় কোন দূর অজানায়।

এমনি রহস্যান্ধকার ঢাকা কোন অজানা জগতের পথে যেন তারা দুজনে হারিয়ে গেছে।

রেবা বলে—রাত হয়েছে। চলো।

মালহোত্রার বাড়িতে সন্ধ্যার আসর বসেছে। সকাল আটটা থেকেই উঁচুতলার মানুষরা স্নান সেরে ব্রেকফাষ্ট খেয়ে কাজে বের হয়। তাদের জীবনটা চাকার উপরেই কাটে, নানা ধান্দা নিয়ে ঘোরে। তাই স্বভাবই গতিময় তারা।

কারখানা, অফিস সেরে শেয়ার মার্কেটে যায়। সেখানে তখন ব্যস্ততা, বাইরের রাস্তার উপর তুলকালাম কাণ্ড বেধে যায়। বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার এর দাম ওঠা নামা করে। তার উপর লাখ লাখ টাকার আনাগোনা হয়।

মালহোত্রা, মীরচান্দানিরা সেখানের ধান্দা সেরে কোন দামী হোটেলে লাঞ্চে যায়।

লঞ্চে খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকেই তখন তাদের অন্ধকারের ব্যবসার পরিকল্পনা হয়। পরামর্শ চলে। আর কবে কি আসছে না আসছে সেই খবর ও আসে।

সেখান থেকে অফিস। এক্সপোর্ট, ইম্পোর্ট এসবের কাজ, প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাযও সেরে তারপর আসে। কোন কোনদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে শহরের বাইরে নির্জনের বাগান বাড়িতে।

শনিবার, রবিবার এখানেই কাটে তাদের। বসতি থেকে দূরে নদীর উপরে বিরাট এলাকা নিয়ে বাগানটা। চারিদিকে উঁচু প্রাচীর তার উপরে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া, গেটে সব সময়েই পাহারা ও রয়েছে।

গেটে ঢুকে বেশ খানিকটা গেলে তারপর বাড়িখানা। পোর্টিকোর্ট ওদিকে ঘরগুলো উঠে গেছে প্রাসাদেরই পেছনে গঙ্গা। এখানে গঙ্গার বিস্তার ও কম নয়।

বাড়িটাকে ঘিরে যেন একটা থমথমে ভাব ফুটে ওঠে। মিঃ পেরেরা ও আসে এখানে। মালহোত্রাজীর বন্ধু বান্ধবরা ও আসে।

গোপালবাবু ও রয়েছে।

গোপালবাবু বলে—রবার্টস্‌কে জামিনে খালাস করে এনেছেন, বাইরে কোথাও পাচার করে দেন এবার।

মীর চান্দানি বলে—তাহলে পুলিশের সন্দেহ হবে।

মালহোত্রা বলে—এনিয়ে ভাবার কিছু নেই। বিজয়বাবু আছেন। মামলা উঠলে ওকে খালাস করিয়ে দেবেন।

—কিন্তু সামলাতে হবে অমিত রায়কে। বহুৎ ট্রাবল দিচ্ছে।

গোপালবাবু দামী স্কচ হুইস্কির স্বাদ গ্রহণ করতে করতে বলে হোম মিনিষ্টার তো জানা শোনা, ভাবছি ওকে। প্রমোশন দিয়ে এখান থেকে সরিয়ে দেব। আর এবার। ইলেকশনে মীর চান্দানিকেই দাঁড় করাবো আমাদের দল থেকে।

মীরচান্দানি ও ভাবছে কথাটা। মিঃ পেরেরা বলে ওঠে।

—দ্যাট উইল বি এ গুড থিং। মীরচান্দানি সাহেব ভি মিনিষ্টার বলবেন। রুপেয়া যা লাগে দিব, ইউ ট্রাই গোপাল বাবু। আপনার কাগজ টাকে ডেলি নিউজপেপার ভি বানিয়ে দেবে। ক্যা মালহোত্রাজী ?

এদের কাছে অন্ধকারের ব্যবসা পত্র ঠিক মত চল্লে এসব কোন সমস্যাই নয়। সোনা, আমদানী; আফিম, হাসিস চালানও বেআইনী জিনিষ আনার কায ঠিকমত চালাতে পারলে তারাও অন্যদের ঠিক মদত দিয়ে যাবে, বিনিময়ে তারা সহযোগিতা চাইবে মাত্র।

গোপালবাবু খুশি হয়েছে। এদের মদত দিয়েই সে সমাজসেবী সেজে আজ বেশ গুছিয়ে নিয়েছে।

মালহোত্রা বলে—পেরেরা অমিত বাবুর উপর ওয়াচ রাখো! গড়বড় করলে এবার আর ওকে ছাড়বেনা।

পেরেরা ও তাই চায়। গোয়াতেও ভালো ব্যবসা পত্র ছিল তার। কিন্তু সেখানের পুলিশ পিছনে লেগে তাকে হঠিয়ে দিয়েছে। বহুৎ লোকসান দিয়ে ওই উপকুল থেকে কলকাতায় এসে এখানে ব্যবসাপত্র করছে সেই সব পুরোনো পার্টিদের সঙ্গে। বাংলাদেশ বর্ডার, নেপাল বর্ডার দিয়েও মাল আসে। কিন্তু এবার ওই অমিত রায়ের জন্য সেই কারবার বন্ধ হতে চলেছে।

মীরচান্দানি ও বলে—জরুর। এইসা কাম ফিন করলে আমরা ভি চুপ করে থাকবো না।

অমিত-এর কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জই।

রবাটস্ কে জামিনে খালাস করিয়ে নিয়েছে ওরা। ক্রমশঃ অমিতের মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে মালহোত্রা, মীরচান্দানির মত শিল্পপতিদের ও হাত আছে এতে। আর যে কোন পথদিয়েই হোক

কিছু দেশনেতা, মাতব্বরদের ও নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে ওই অন্ধকারের মানুষগুলো যে কোন উপায়েই।

অমিত এই রহস্যময় জগতের বিচিত্র তথ্য কিছু প্রকাশ করবেই।

অমিতের সহকারী সাবইন্‌সপেক্টার খলিল সাহেব ও অমিতের গুণমুগ্ধ। খলিল ও নিষ্ঠাবান, সৎ কর্মচারী। সাহসীও।

খলিলই বলে—মালপত্র ওদের কোন ও গুদামে প্রচুর মজুত আছে। এর মধ্যে খোঁজ খবর নেবার জন্য লোকও লাগিয়েছে।

অমিত কি ভাবছে। জানায় সে—

সেই খবরই দরকার খলিল সাহেব, এখন ক'দিন ওরা মালপত্র বিশেষ সরাবার চেষ্টা করবেনা বলেই মনেহয়। এই সুযোগ।

নদীর ধারের পুরোনো এলাকা।

এককালে যখন নদীপথেই বেশী বাণিজ্য চলতো তখন থেকেই এখানে গড়ে উঠেছে সারবন্দী ছোট বড় গুদাম। এখানে জনবসতি বিশেষ নেই, শুধু গুদামের রাজ্য।

বহু কালের পুরোনো বাড়িগুলো অন্ধকারে হাড় পাজরা বেরকরে দাঁড়িয়ে আছে। সারা কলকাতা কেন পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন মাল-পত্র এখানে মজুত থাকে।

বলে সে সরিয়ে ফেলবো ওসব।

পেরেরা বলে—নো। পুলিশ যদি নজর রাখে মাল ধরে ফেলবে। তার চেয়ে যেমন আছে থাকুক। আমাদের ভি ওয়াচ রাখতে হবে। যদি পুলিশ অমিত রায় আসে ওখানে আর ফিরে যাবে না।

খবরটা ঠিকই এসেছে।

মীরচান্দানির ওখানে নাকি প্রচুর মালপত্র লুকোনো রয়েছে।

অমিত বলে খলিল সাহেব চেষ্টা করবো আমরা।

সব শুদ্ধ ধরতেই হবে। খবরটা সঠিক কিনা জানা দরকার। ওরা তাই খোঁজ খবর নিচ্ছে নানা ভাবে।

লেখা এই সংসারের হালটা ধরে আছে কঠিন নিপুণহাতে সকাল থেকেই যেন ঝড় শুরু হয়। বুড়ো হরিপদ সাহেবের চা নিয়ে আসে লাইব্রেরীতে।

বিজয় সকাল ছটা থেকেই লাইব্রেরীতে বসে যায় নিজের কাজ নিয়ে। গণেশ গোঁসাইকে নোট দিতে থাকে। টাইপিষ্টও এসে যায়।

হরিপদ এখানে চা দিয়ে উপরে গিয়ে এবার বৌদিমণির কাজে হাত লাগায়। একটু পরেই তনুশ্রীকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। ছোট্ট মেয়েটা দাপাদাপি সুরু করেছে।

লেখার তাকেও সামলাতে হয়, সংসারের টুকিটাকি কাজগুলো একত্রে অনেক হয়ে পড়ে। তারপরই সুরু হয় বিজয়ের কোর্টে যাবার আয়োজন।

খেয়ে দেয়ে বিজয় হাঁকাহাঁকি সুরু করে।

—আমার প্যান্ট, সার্ট, টাই।

এসব ওর বেয়ারাকে দিয়ে হবেনা।

লেখাকে দরকার। সব গোছগাছ করে লেখা বলে।

—নিজেরটার দিকে নিজে একটু নজর রাখো।

—কেন? তার জন্যে তো তুমি আছো? বিজয় শোনায়।

লেখা বলে—চিরকালই কি থাকবো আমি?

বিজয় লেখাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে আদর করে।

—তুমি না থাকলে আমিও হারিয়ে যাবো লেখা।

—আহা। লেখা ওই আদরটুকুর জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে যৌবনের প্রথম থেকেই তারা দুজনে দুজনকে কেন্দ্র করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছিল। আজও সেই স্মৃতির সুরভি মাখা জগতের স্বপ্নে রয়ে গেছে তারা।

বিজয় বলে—সত্যি লেখা। তোমাকে ছাড়া বাঁচার কথা ভাবতেও পারিনা। আমার জীবনের সঙ্গে তাই অজানতেই তুমিও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে গেছে।

লেখার ভালো লাগে।

তবু বলে সে—উকিল সাহেবের এইসব হবে, কোর্টে যেতে হবে না?

খেয়াল হয় বিজয়ের।

নীচে নেমে আসে। গণেশ গোঁসাই তার আগেই আজকের নথীপত্র রেফারেন্স বই সব গুছিয়ে গাড়িতে তুলেছে। সাহেব আসতে সেও বের হয় গাড়িতে।

লেখার এবার একটু অবকাশ মেলে।

ক'দিন ধরেই দেখছে লেখা রেবা প্রতিদিন বৈকালে বের হয়। কাল একটু সন্ধ্যার পরই ফিরেছে গুণ গুণ সুরে গান গাইতে গাইতে। ক'দিন পর রেবাকে যেন খুশীই দেখায়।

লেখা শুধোয়—কি ব্যাপার রে? এত খুশী খুশী?

রেবা একটু চমকে ওঠে। লেখা শুধোয়।

—কদিন দেখছি খুব বের হচ্ছিস?

রেবা যেন ধরা পড়ে গেছে। তাই রেবা ওই প্রশ্নটা এড়াবার জন্য বলে কতদিন পর কলকাতায় ফিরছি। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে একটু দেখা করতে গেছলাম বৌদি।

লেখা কপট গাম্ভীর্য নিয়ে বলে।

—তাদের নাম কি?

—কেন? রেবা যেন সন্দেহের গন্ধ পায়।

লেখা বলে—এমনিই শুধোচ্ছি।

রেবা কয়েকটা পুরোনো সহপাঠিনীর নাম গড় গড় করে বলে যায়।

লেখা দেখছে ওকে। মেয়েটার মুখে চোখে খুশির ঝলক তার নজর এড়ায় নি।

রেবার মনে খুশীর সুর জাগে।

নিজের ঘরে ডাইরীটা লিখছে সে।

ডাইরী লেখা তার অনেকদিনের অভ্যাস।

এ যেন নিজের কাছে নিজেকে মেলে ধরা, তার মনের সঙ্গে অন্যমন তার কাজের সমালোচনাও করে, ভুল গুলোকেও সে বিচার করে। তার মনের সুন্দর স্মৃতিও গুলোকে বারবার অনুভব করতে পারে। তাই ডাইরীর মধ্যে ডুবে যায় রেবা।

লেখা সংসারের কাজ কিছুটা দেখে এইবার চা খেতে বসে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে। তাই রেবার ঘরে টিপট এনেছে, চা-টা আর কারোও সঙ্গে বসে খেলে বেশী ভালো লাগে।

রেবাকে গভীর মনোযোগ দিয়ে কি পড়তে দেখে লেখা বলে, —এত কি পড়ছিস রেবা?

রেবা গভীর মনোযোগ দিয়ে ডাইরীটা পড়ছিল। বৌদিকে দেখে বলে—অ তুমি?

পরক্ষণেই ওকে এড়াবার জন্য বলে রেবা।

—ইয়ে এম—এটা পড়বো ভাবছি বৌদি, তাই বইগুলো একটু দেখছিলাম।

লেখা বলে—তা ভালো। দিনরাত হৈচৈ করে না ঘুরে পড়াশোনা নিয়ে থাকা ভালোই, নে চা খাবি না?

রেবা উঠে বাথরুমের দিকে যায়।

মুখে চোখে জল দিয়ে এসে চা খাবে।

ও বাথরুমে গেছে। চায়ের কাপটা রাখতে এসে লেখা কি খেয়াল বশে বিছানায় রাখা বাঁধানো বইটা তুলে নিয়ে একটু অবাক হয়। বই নয়, ডাইরীই।

রেবা কি সব লিখেছে তার রোজনামচা। হঠাৎ তার একটা পাতায় লেখার চোখ আটকে যায়। দিন তারিখ দিয়ে কেজকার কথা লেখা।

বারোই মার্চ—সুমিত আর আমি এক ঝড়বাদলের রাতে কোন ফরেষ্ট বাংলোয় এসে আশ্রয় নিয়েছি। এক ঘরের মধ্যে দুজনে, সারা মনে আমার অবিশ্বাস, ভয়, কিন্তু দেখলাম সুমিতকে। অপূর্ব একটি মানুষ। তার উপর বিশ্বাস বাড়লো। ভালোবাসার আলোয় তাকে আর নিজেকে নোতুন করে চিনলাম।

চমকে ওঠে লেখা।

পাতায় পাতায় অনেক কথাই লেখা। ভালোবাসার ঝড় ওঠা মনে আজ রেবার কি তৃপ্তি জাগে।

তার কথাতেই সুমিত দূরের চাকরীটা নিলনা। একজন পুরুষের জীবনে রেবা নিজের আসন পেতেছে। আজ স্বপ্ন দেখে তারা দুজনে।

লেখা তন্ময় হয়ে পড়ছে ডাইরীটা। রেবার জীবনের গোপনতম আনন্দের খবরটা আজ সে জেনেছে। রেবা এই খবরের সবকিছুই গোপন করে রেখেছিল এতদিন।

রেবা বাথরুম থেকে বার হয়ে এসে বৌদিকে তার ডাইরী পড়তে দেখে চমকে ওঠে। লেখাও এবার বেশ জোর করে দুচারটে লাইন ওর থেকে পড়তে থাকে।

রেবা বলে—বৌদি, প্লিজ—

লেখা শোনায়—এই তোর এম-এর বই? এই পড়া হচ্ছে? সুমিতকে চিনিসনা? দার্জিলিং-এ দুজনে—

রেবা এবার বৌদিকে জড়িয়ে ধরে কাতর কণ্ঠে বলে,

—দোহাই বৌদি! প্লিজ, এ নিয়ে কিছু বলোনা কাউকে, লক্ষ্মীটি!

লেখা হাসছে। বলে সে এবার দেখছি!

লক্ষ্মীটি। রেবা বৌদিকে জড়িয়ে ধরেছে। আজ রেবার জীবনের গোপনতম সম্পদের সন্ধান পেয়েছে লেখা।

বলে লেখা—আমার কাছে আসতেই হবে রেবা।

লেখাও কথাটা ভেবেছে।

সুমিত ছেলে হিসেবে ভালোই। ফার্ষ্ট ক্লাশ পেয়েছে এম-এ-তে। আই-সি-এস পরীক্ষা দিয়েছে, পাশ করবেই। না হলে এখানেও প্রফেসারী পেতে পারে।

আর রেবার সঙ্গে বিয়ে হলে এরা সকলেই খুশী হবে, তাই সন্ধ্যার পর সেদিন অমিত মীনা এ বাড়িতে আসতে লেখাই কথাটা তোলে।

সুমিত নাকি বাইরে কোথায় প্রফেসারি নিয়ে যাবে শুনছিলাম।

বিজয় বলে—সেকি?

মীনা জানায়—বলছিল বটে, তবে আমার বাপু মন চাইছে না। ওর দাদা তো দিনরাত বাইরেই থাকে, বাড়িতে তবু সুমিত থাকে একটা ভরসা হয়, আর ওকে দূরে পাঠাতে চাই না।

লেখা বলে—ঠিক কথাই।

বিজয়কে বলে সে—তোমার তো অনেক বড় বড় মক্কেল আছে শুনেছি, ছাখনা কাউকে বলে এখানের কলেজে যদি কাজটাজ পায় ও।

বিজয় কি ভাবছে।

বলে সে—তা চেষ্টা করলে হয়।

লেখা বলে—তাই করো। আর মীনা, চাকরী বাকরী হলে এবার সুমিতের বিয়ে থা দিয়ে দাও, তবু একটা সঙ্গী পাবে। আর যদি রাজী থাকো তাহলে ছাখো রেবার সঙ্গেই না হয়।

অমিত খুশী হয়—তাই তো। এ গুড প্রপোজাল। চাকরী একটা হবেই যেখানে হোক। তার আগে ও বিয়েটা হতে পারে।

—কি বল বিজয়? হাসছে ওরা।

অমিত বলে—বর কর্তা হিসাবে আমার কিন্তু ফুল কনসেন্ট রইল।

লেখা শোনায়—দিন বদলেছে অমিতবাবু। যারা বিয়ে করবে তাদের মতামতটা ও দরকার। কি মীনা?

মীনা ও এমন বিয়েতে রাজী। সে বলে।

—সুমিত ঠাকুরপোর মত আমি করাবো।

…চা খাবার এনেছে হরিপদ। রেবা ওদিক থেকে এদের হাসি আর এই সব আলোচনা শুনে লজ্জায় সরে গেছে আড়ালে।

বৌদি সত্যিই ভালো। তার দুর্বলতার কথাটা একেবারে চেপে গেছে ওদের সামনে। ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ অন্য ভাবে উপস্থাপিত করেছে।

বেশ খুশির মেজাজেই আড্ডা জমে উঠেছে। অমিত ওখানে আসে তার পুলিশের কাযের এক ঘেয়েমি ভুলে থাকতে। লেখা মীনা ও পরস্পরকে বোনের মত ভালোবাসে। হঠাৎ ফোনটা বেজে ওঠে। অমিতের ফোন। ওর সহকারী খলিল সাহের ফোন করছে উত্তেজিত স্বরে।

—স্যার। ওদের গুদামের সন্ধান পেয়েছি স্যার। কিন্তু ওরা আজ রাতেই মাল সব পাচার করে দেবার চেষ্টা করছে। যা করার আজই করতে হবে। দেরী করা যাবে না।

অমিত কিছুদিন ধরেই এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। আজ খবরটা পেয়ে বলে—আমি আসছি এখুনি। তুমি ফোর্স কিছু রেডি রাখো।

ফোনটা নামিয়ে বলে অমিত—বৌঠান, বিজয় আমাকে এখুনিই বের হতে হবে। মীনাকে বরং তোমাদের গাড়িতে পৌঁছে দিও।

মীনা কি বলতে চায়। কিন্তু অমিতের শোনার সময় নেই। রাতের অন্ধকারে অমিত বের হয়ে গেল। আজ তার সামনে একটা কঠিন পরীক্ষা, এ পরীক্ষায় তাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে। কোনমতে ওদের গুদামে মাল ধরতে পারলে ওদের কায়দা করা যাবে। আর জাল কেটে বের হতে পারবে না কিছুতেই।

রাতের অন্ধকারে অমিতের জিপটা চলেছে আগে আগে, খলিল

সাহেব ও রয়েছে। নদীর ধারের পুরানো নির্জন এলাকা। ঠাঁই ঠাঁই আবর্জনা জমে আছে। সরু পথের দুদিকে উঁচু উঁচু বাড়িগুলো থম থমে আঁধারে দাঁড়িয়ে আছে।

দিনের বেলায় এখানে ঠেলা, ট্রাকের ভিড় লোকজনের কলরব ওঠে। এখন সব স্তব্ধ। মাঝে মাঝে গুদামের ডাল, গম খাওয়া কুঁদো ইন্দুরগুলো গাড়ির আলোয় হকচকিয়ে দৌড়ে সরে যায়।

অমিত সামনের দিকে নজর রেখে চলেছে। মীরচান্দানির গুদামে ব্যস্ততা স্নুরু হয়েছে। মিঃ পেরেরা রবার্টস্ ও রয়েছে। রাতারাতি এ গুদাম থেকে মাল পত্র অন্যত্র সরাতেই হবে।

মীরচান্দানি তাড়া দেয়—জলদি করো ম্যান!

হঠাৎ গেটের ওদিক থেকে জিপটাকে ঠেলে ঢুকতে দেখে চমকে ওঠে মীরচান্দানি।

—পুলিশ! ওরা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। অমিত খলিল সাহেব আর কয়েক জন পুলিশ নিয়ে নেমেছে। পুরোনো গুদামের চুনবালি ওঠা দেওয়ালে দুচারটে বাতি জ্বলছে মিটমিট করে।

ভিতরের শেডটার নীচে থাকে থাকে মাল সাজানো, কাঠের পুরোনো সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। কোন আদ্যিকালের সিঁড়ি, জীর্ণ হালকা। উপরের মাচার মত করা, সেখানে স্তূপ করা আছে পাটের বেল, প্যাকিং কাঠের বড় বড় বাক্সে নানা মাল পত্তর। রাশিকৃত ড্রাম আর ও অনেক কিছু মাল।

এক নম্বরী ওই সব মালের মধ্যে মধ্যে বেআইনী মাল ও প্রচুর আছে।

হঠাৎ পুলিশ এখানেই হানা দেবে তা ভাবেনি ওরা। তাদের সুরক্ষিত গোপন গুদামে ঠিক খোঁজ নিয়ে এসেছে ইনস্পেক্টার অমিত রায়। এবার হাতে নাতে ধরা পড়বে মীরাচান্দানির মত নামকরা শিল্পপতি।

মীরচান্দানি রেগে উঠেছে। চরম বিপদে সে মরীয়া হয়ে

উঠেছে। পেরেরা গর্জে ওঠে—আজ ওকে দেখে নোব বস্। কুইক হঠ যাইয়ে পিছু গেটমে।

মীরচান্দানি বলে—ফিনিস্ হিম।

পেরেরা রবাটস এবার কাযে লেগেছে। আলোটা অফ করে দিতে সারা গুদামে জমাট অন্ধকার নামে। ওরা সরে গেছে ওদিকে।

আলো নিভে যেতে ও থামে না অমিত। টর্চজ্বেলে চীৎকার করে সে—জলদি টেক পজিসান। দরজা গার্ড করো। ইর্মাজেন্সি লাইট জ্বালো।

অমিত আজ হাতে পেয়েছে ওদের। নিশ্চয়ই দোতলার ওদিকে কোথাও আছে অপরাধীর দল। সে সিঁড়ির দিকে ছুটে চলেছে। উপরে উঠছে সেই পুরানো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে।

পেরেরা এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। অমিত সিঁড়ির কাছে আসতেই এবার ওরা অন্ধকারের মধ্যে জীর্ণ সিঁড়ির উপর পাটের গাঁট, ভারি ড্রামগুলো গড়িয়ে দেয়। বহুকালের সিঁড়িটা ওই বিরাট ভারে কাঁপছে—মড় মড় করছে।

লতিফ চীৎকার করে—মিঃ রায়, ভাঙ্গা সিড়ি। হুঁসিয়ার। তার আগেই প্রচণ্ড শব্দে এতদিনের পুরোনো সিঁড়িটা সবশুদ্ধ ধ্বসে পড়ে বিকট শব্দে। ধুলো উড়ছে, ছিটিয়ে পড়ে পাটের বেল, ভারি ড্রামগুলো।

লতিফ চীৎকার করে—স্যার।

কিন্তু কোন সাড়া নেই।

ওই ধ্বংসস্তূপের নীচে অমিত রায়ের দেহটা কোথায় হারিয়ে গেছে। আর গুদামের লোকজনও এই অবকাশে কোথায় পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালিয়ে গেছে।

পুলিশের বড়সাহেব আর ও অনেকে এসেছে। তখন দিনের আলো ফুটে উঠছে। কয়েক ঘণ্টা ওরা দমকলের লোকদের সঙ্গে হাত

লাগিয়ে ওই ধ্বসে পড়া সিঁড়ির নীচেকার ধ্বংসস্তূপের অতল থেকে অমিতের বিকৃত প্রাণহীন দেহটা বের করে।

সুমিত ও এসেছে খবর পেয়ে। বিজয় সেন ও এসেছে। কর্তব্যরত অবস্থায় তার প্রিয় বন্ধু অমিতের এই শোচনীয় মৃত্যুতে সে ও দুঃখ পেয়েছে।

দুজনে স্কুল থেকে একত্রে মিশেছে, আজ ও বিজয়ের মত কর্মব্যস্ত মানুষের সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিল ওই অমিতই। সে ও চলে গেল।

পদস্থ কোন পুলিশ কর্মচারী মিঃ দে সব দেখে শুনে বলে কমিশনারকে—এ্যাকসিডেন্টই স্যার। পুরোনো ভাঙা সিঁড়িটা ধ্বসে পড়েছিল ওর উপর।

বিজয় ও ভাবছে কথাটা। কিন্তু সুমিত বলে ওঠে—এ্যাকসিডেন্ট ঘটেছিল নয়, ওটাকে ঘটানো হয়েছিল স্যার।

পুলিশ কমিশনার তরুণটির কথায় চাইলেন। অমিতের ছোট ভাই। পুলিশ কমিশনার প্রশ্ন করেন—কি করে বুঝলে?

সুমিত বলে—সিঁড়ির উপর ওই পাটের গাট, ভারি ভারি ড্রাম-গুলো থাকার কথা নয়, ওগুলো উপরেই রয়েছে আরও। বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে অমিত বাবুকে বিপদে ফেলার জন্যই ওই ভারি মাল-গুলো সিঁড়িতে ফেলা হয়েছিল। জীর্ণ সিঁড়িতে হঠাৎ ওইসব ভারি জিনিষগুলো পড়তে সেটা সব নিয়ে ধ্বসে পড়ে দাদার উপর। তারা খুনই করতে চেয়েছিল যাতে অমিত বাবু এ ভাবে আর তাদের ডেরায় হানা না দিতে পারেন।

পুলিশ কমিশনার ও ভাবছেন কথাটা। পুলিশ অফিসার মিঃ দে বলেন—তা ও হতে পারে স্যার, কিন্তু কোন লোককেই এখানে দেখা যায় নি।

সুমিত বলে—কায হাঁসিল করে তারা নিশ্চয়ই পুলিশের হাতে ধরা দেবার জন্য বসে থাকবে না। পালিয়েছে।

মিঃ দে বলেন—সম্ভবতঃ তাইই। কিন্তু এভাবে কোন চার্জই ফ্রেম করা যাবে না।

সুমিত হতাশ হয়ে চাইল। বিজয় ও ভাবছে কথাটা। বলে সে—আইনের সামনে এসব প্রমাণ করা যাবে না।

সুমিত বলে—তাই বলে এতবড় হত্যার বিচার হবে না? দোষীরা সাজা পাবে না?

পুলিশ কমিশনার দেখছেন সুমিতকে। ওর দাদার এই আকস্মিক মৃত্যু ওকে গভীর ভাবে বিচলিত করেছে। কিন্তু করার কিছু নেই। বলেন তিনি।

—আই ফিল্ ফর ইউ সুমিত। অমিতের মত যোগ্য, সৎ অফিসারের এই মৃত্যুর তদন্ত হবেই। আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো।

সুমিত বলে—তাই করুন স্যার। এ মৃত্যু নয়, হত্যা। দাদাকে খুন করা হয়েছে সুপরিকল্পিত উপায়ে। আই এ্যাম ডেফিনিট। আর এই খুনের ব্যাপারে সেই অন্ধকারের মানুষগুলোই জড়িত। তাদের স্বার্থে ঘা পড়তে তারা ক্ষেপে উঠেছিল।

মীনা খবরটা পেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। লেখা-রেবাও এসেছে ওর কাছে। এই চরম বিপদে কি সান্ত্বনা দেবে তা জানেনা। আজ মীনার সুখের সংসারে দুঃখের কালো মেঘ ছেয়ে গেছে। স্বপ্ন দেখছিল মীনা তার সংসার শান্তিতে পূর্ণ হবে।

কিন্তু এমনি দিনে তার সব হারিয়ে গেল।

লেখা বলে—যা হবার হয়ে গেল মীনা, কেঁদে আর কি হবে? এখন সুমিতের দিকে চেয়ে বুক বাঁধো।

ওকে এতবড় দুঃখে সান্ত্বনা দেবারও আর কেউ নেই। দুঃখ, শোক মানুষকে বিচলিত করে, মীনা ও তাই আজ বিচলিত।

সুমিত স্তব্ধ হয়ে গেছে। রেবা দেখছে ওকে! দুজনে অনেক স্বপ্ন দেখেছিল। আজ রেবা তাই ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

সুমিত বলে—এ আমি ভাবতে পারছিনা রেবা ?

রেবা দেখছে ওকে। বলে সে।

—তবু এ দুঃখকে মেনে নিয়ে আবার বুক বেঁধে চলতে হবে সুমিত। তোমার বৌদির তুমি ছাড়া কেউ নেই। এসময় তুমি ভেঙ্গে পড়লে ওকে কে দেখবে ?

কথাটা সত্যিই। বৌদি এ সংসারে এসে সেদিন সব ভার তুলে নিয়েছিলো। সুমিত তখন ছোট। বাবা, মাকে তার মনে পড়েনা। দাদা, বৌদিই তার সব অভাব পূরণ করেছিল।

আজ বৌদিকে তাকেই দেখতে হবে।

পুরুষের শোকে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। সুমিত দেখছে রেবাকে।

রেবা বলে—পথ একটা হবেই। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে সুমিত।

একদিক ভাঙ্গে অন্যদিক গড়ে ওঠে, প্রকৃতির নিয়মে এমনি একটা ব্যবস্থা কোথাও রয়ে গেছে। সুমিতের কম্পিটেটিভ পরীক্ষার ফল বের হয়েছে। আই-পি-এস পরীক্ষায় সে ষ্ট্যাণ্ড করেছে।

কিন্তু অমিত আজ নেই। ছোট ভাই এর এই কৃতিত্বের খবর তার কাছে পৌঁছে নি। বিজয় বলে—অমিত এটা জেনে গেলনা।

মীনাও ভাবছে কথাটা। বলে সে

—কিন্তু সুমিতকে আমি আবার ওই পুলিশের চাকরীতে যেতে দেবনা। একজন তো গেল ওই চাকরী করতে গিয়ে, আবার জেনে শুনে সুমিতকে পাঠাতে পারবোনা বিজয় ঠাকুরপো। ওকে বরং প্রফেসারীর কাজই দেখে দাও। বেশী পয়সায় আমার দরকার নেই।

সুমিত ও ভাবছে কথাটা। দাদার সেই মৃত্যুটা ওর মনের ভাবনা চিন্তার রাজ্যে একটা ওলটপালট এনেছে।

বিজয় বলে—এখুনিই ওনিয়ে কিছু ভাবার দরকার নেই বৌঠান। সুমিত ও ভাবুক এ নিয়ে, তারপর যা হয় করা যাবে।

সুমিত ও ভেবেছে এনিয়ে। সারাদিন ঘরে মন টেকেনা তার। রেবা আসে। ক্রমশঃ রেবা ও মীনাকে আর ও কাছে টেনে নিয়েছে। সেদিন ফোনটা বাজতে রেবাই ধরে। সুমিতের ফোন। পুলিশ কমিশনার সাহেব ওকে একবার দেখা করতে বলেছেন কি জরুরী দরকারে।

সুমিত ও ভেবেছে কথাটা। তার দাদার হত্যার তদন্ত চলছে মাত্র। কিন্তু কোন সার্থকতার মুখ দেখেনি তারা। সুমিতের মনে হয় সে নিজেই এ কাযে নামবে। দাদার হত্যাকারীদের খুঁজে বের করে তাদের শাস্তি দিতে না পারলে নিজেও সে শান্তি পাবেনা।

পুলিশ কমিশনার সাহেব কি জরুরী দরকারে ডেকেছেন তাই এসেছে সুমিত।

পুলিশ কমিশনার গেজেটটা দেখিয়ে বলেন।

—কন্‌গ্রাচুলেসন্‌স্‌ সুমিত। আই-পি-এস এ ষ্ট্যাণ্ড করেছো জেনে আমিও হোম মিনিষ্ট্রিকে বলেছিলাম, তারা তোমাকে এখানেই পোষ্টিং করতে চান।

সুমিত চাইল ওর দিকে।

বলে সে—বৌদির ঠিক মত নেই স্যার। উনি চান প্রফেসারীতেই যাই।

কমিশনার সাহেব বলেন।

—তোমার বৌদির পক্ষে এই সিদ্ধান্ত নেওয়াই স্বাভাবিক ব্যাপার সুমিত। দাদার সাডেন ডেথ ওকে বিচলিত করে তুলেছে। কিন্তু তোমার মত এ্যাকটিভ্‌ ইয়ং ম্যানের পক্ষে এমন চান্স ছাড়া উচিত নয়। তোমার দাদার মত সব নিষ্ঠাবান পুলিশ অফিসার ছিল

পুলিশ বিভাগের গর্ব। আমিও চাই তুমি এসো, দাদার ঐতিহ্য বজায় থাকবে।

আর তোমার দাদার মৃত্যুর তদন্তটাও ঠিক মত হবে। এটা তোমারও কর্তব্য।

চমকে ওঠে সুমিত।

কমিশনার সাহেব তার মনের সেই দুর্বলতম জায়গাতেই আঘাত করেছেন। সুমিত ভাবছে দাদার নিষ্ঠুর মৃত্যুর দৃশ্যটা। সেই অপরাধের আজও বিচার হয়নি। অপরাধীরা সমাজের বুকে মুখ লুকিয়ে মিলিয়ে আছে।

সুমিত সেই অন্ধকারের জীবদের টেনে বের করে শাস্তি দেবে। এতবড় অন্যায়ের প্রতিকার করবে।

কমিশনার সাহেবও লক্ষ্য করছেন সুমিতের এই ভাবান্তরটাকে। বলেন তিনি—কোন দ্বিধা করোনা সুমিত। এখানে ভালো কাজ করারও অনেক সুযোগ আছে। এ সমাজের সেবার কাজই, যদি একে ব্রতের মত নিতে পারো। তোমার দাদাও তাই নিয়েছিলেন। অবশ্য যদি ভয় পাও—কোন সংশয় থাকে আমি জোর করবো না। ইউ আর এ্যাট লিবার্টি টু এ্যাকসেপ্ট আর রিজেক্ট ইট।

সুমিত মনস্থির করে ফেলেছে দাদার হত্যাকারীদের সে খুঁজে বের করবেই একদিন। তাই এই কাজই নিতে হবে তাকে।

সে ভীরু নয়। সুমিত বলে।

—আমি রাজী স্যার।

কমিশনার সাহেবও খুশী হন—ভেরি গুড। দ্যাটস্ লাইক এ রাইট ইয়ংম্যান।

সুমিতের হাতটা ধরে তিনি সেকল্যাণ্ড করে বলেন।

—আমি জানতাম তুমি আসবেই।

বিজয় বৈকালে কোর্ট থেকে ফিরে বাগানে চায়ের টেবিলে বসে

লেখার সঙ্গে গল্প করছে। আজ তার কাজ একটু কম। গণেশ গোঁসাই ও ক'দিন পর সন্ধ্যার ছুটি পেয়ে কোথায় সিনেমা দেখতে গেছে। লোকটার আর কোনো বাতিক নেই ওই সিনেমা দেখা ছাড়া।

রেবাও রয়েছে ওদিকে তনুশ্রী বাগানে ফুলের বেডে কোথায় প্রজাপতির পিছনে ঘুরছে।

হঠাৎ হরিপদকে দেখা যায় হন্তদন্ত হয়ে আসতে। বুড়োর একটা ভয় রয়ে গেছে এখনও, পুলিশের ভয়। গাঁইয়া মানুষ, এতকাল শহরে থেকেও পুলিশের ভয়টাকে এড়াতে পারেনি। অমিতবাবু মারা যাবার পর পুলিশ এ বাড়িতে আর আসেনি।

অমিতও মাঝে মাঝে ওকে ভয় দেখাতো।

—হরিদা থানাতে একদিন তোমাকে এ্যারেষ্ট করে নিয়ে যাবো।

হরিপদর বুক কাঁপতো থানা পুলিশের নামে। তবু মুখে হাসি এনে বলতো সে—গেলেই হল? বিজয় ছাড়িয়ে আনবে।

আজ বেশ কিছুদিন পর এ বাড়িতে পুলিশের গাড়ি থেকে কোন পুলিশ অফিসারকে নামতে দেখে হরিপদ এসে ঘরে খবর দেয়। —বিজয়, পুলিশ এসেছে।

—পুলিশ! লেখা অবাক হয়। শুধোয়—কি ব্যাপার কে?

হরিপদ বলে—কে তা কি করে জানবো? সব পুলিশই দেখতে একরকম। ওই তো আসছে।

লেখা দেখে একটি তরুণকে আসতে। পরণে পুলিসের অফিসারের পোষাক। হাতে বেটন, কোমরে রিভলবার। বিজয়ও দেখছে। কাছে এসে ওকে প্রণাম করতে দেখে লেখা অবাক হয় —তুমি। সুমিত? বসো।

সুমিত বিজয়কেও প্রণাম করে বলে।

—কমিশনার সাহেব নিজে বললেন, আর আমার মনেও কথাটা

এলো। তাই চাকরীটা নিলাম বিজয় দা। আজ দাদা নেই, তাই তোমাদেরই প্রণাম করতে এলাম।

লেখা ওর মাথায় হাত দিয়ে বলে—জয়ী হও ভাই! আরও বড় হও। তবে তোমার এই দাদাটিকে একটু এড়িয়ে চলো?

হাসে বিজয়—কেন? আমি আবার কি দোষ করলাম?

লেখা বলে—ও বেচারা খেটেখুটে এক একটা আসামীকে ধরে এনে আদালতে হাজির করবে, আর তাদের শাস্তি হওয়া দূরেরকথা তুমি আইনের কূট প্যাচে ফেলে তাদের পুরোপুরি নির্দোষ সাধু বানিয়ে খালাস করে দেবে।

সুমিতও হেসে ওঠে—তাই নাকি?

লেখা বলে—ওই নিয়ে তোমার দাদা কি ওকে কম সাবধান করতো, কিন্তু কে শোনে কার কথা! নাও, চা খাও। কইরে রেবা!

রেবা চা পাঠিয়ে দিয়েছে।

বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। বাগানের এদিকের গাছে গাছে ছায়া অন্ধকার নেমেছে। রেবা আর সুমিত এই দিকেই এসেছে। সুমিত বলে,

—তুমি খুশী হওনি রেবা। বৌদিতো প্রথমে কেঁদে ফেললো—তারপর কোন মতে বোঝালাম।

রেবা বলে—না, না। ভালোই করেছো।

সুমিত বলে—দাদার হত্যাকারীদের আমি ছাড়বো না রেবা। সমাজের বুকে এমনি অন্ধকারের কালো হাতগুলোকে আমি চেষ্টা করবো দুমড়ে মুচড়ে দিতে।

সন্ধ্যা নামছে।

পাখীদের কলরব ওঠে। ওদিকের আদি গঙ্গায় খালে তখন এসেছে ভাটার টান। দুদিকের কাদা বের হয়ে পড়েছে। ওটা যেন

সমাজের ভিতরের রূপটার মতই, একদিন অন্যসময় ঢাকা থাকে। কিন্তু ওর ভিতরটা অমনি ক্লেদাক্তই।

সুমিতও সমাজের আসল রূপটাকে দেখে যেন শিউরে উঠেছে।

রেবা বলে, এখন কোথায় পোষ্টিং হল!

—গঙ্গার ধারের একটা থানাতেই এসেছি।

সুমিত জানায়। বলে সে।

—শহরের ঘিঞ্জী এলাকার একদিকে নদীর ধারেই কিছুটা খোলা মেলা থাকে, তাই বৈকালে এখানেই অনেকে আসে। আর এলাকাতে কিছু বাজে ছেলেদেরও ভিড় হয়।

নদীর ধারে এখানে ওখানে চোলাই মদের ঠেকও বসে। ছেলেমেয়েদের বিরক্তও করে, সন্ধ্যার মুখে ফাঁকায় কাউকে পেলে ব্যাস—ঘড়ি, গলার হারও ছেনতাই হয়। এতদিন ধরে তারা এখানে তাদের অবাধ বাণিজ্য চালিয়েছে। থানাতে অনেকে অভিযোগ করেছে। কিন্তু তেমন কোন সুরাহা হয়নি।

রেবাও মাঝে মাঝে এদিকে আসে। সে আর সুমিত আসতো এখানে, নদীর ধারে। পুরোনো বটগাছের ছায়ায়, না হয় বালুচরে বসতো তারা। আজ রেবা এসেছে এদিকে।

দু পাশে একটা গাছের নীচে কিছু ছেলের দল চোলাই মদের সন্ধান পেয়ে বসে গেছে। হঠাৎ রেবাকে আসতে দেখে বলে। মাল খান্ তো মন্দ নয় রে?—রেবা চাইল ওদের দিকে। একজন হ্যাংলা মত ছেলে একটু বেশী সাহসীই। সে এগিয়ে এসে বলে যাবো নাকি সঙ্গে।

রেবা চটে ওঠে—কি বল্লে? ছেলেটা হাসছে। তার সঙ্গী আরও দু'একজন এসে পড়ে। বলে তারা

এত চটছো কেন মাইরী? একটু বসে গল্পগাছা করতাম, রসের গল্প টল্প।

—ইতর কোথাকার। রেবা চাপা স্বরে গর্জন করে দুতিনজন ছেলে তাকে ঘিরে ফেলেছে। বিপদে পড়েছে রেবা। হঠাৎ সুমিতকে দেখে চাইল। ছোকরার দল তাকে বলে—ফুটে যাও চাঁদ। নাহলে খুপরি খারাপ করে দেব।

ওরা চেনেনা সুমিতকে। সুমিত ও জায়গাটার সম্বন্ধে নিজে খবর নেবার জন্য সাদা পোষাকেই এসেছিল। এবার সুমিতের একটা ঘুঁসিতে ছিটকে পড়ে ছেলেটা গাছের গোড়ায়। তাকে পড়তে দেখে বাকী অন্যরাও এসে পড়ে। কিন্তু কিছু করার আগে তারাই বেধড়ক মার খেয়ে চাঙ্গা হয়ে যায়।

দুজন কনষ্টেবলও এসে পড়ে।

সুমিত দলের দুচারটেকে কলার ধরে তুলে বলে।

—এদের থানায় নিয়ে চল। আর তোমরা কি কর এখানে? চোলাই মদের ঠেক বসেছে দেখোনা? নিয়ে চল ওদের!

আর এখানে অনেক নষ্টামি চলে, আমি এসব বরদাস্ত করবো না। গড়বড় দেখলে থানায় তুলে নিয়ে যাবো।

একদিনেই নদীর ধারের পরিবেশকে পরিষ্কার করে তোলে। সাধারণ মানুষও জানতে পারে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সরকারও বদ্ধপরিকর।

নদীর ধীরে রাতের অন্ধকারে চোরা চালান, বেআইনি, দুনিয়পত্র নামানোর কাজও চলে। ওরা গভীর জলের মাছ। তাই সহজে ধরা যায় না। অমিত ক্রমশঃ খবরগুলো পাচ্ছে, এখানে সে নিজেরই খবর দেবার যোগসূত্র গড়ে তুলেছে। সেই দিন বৈকালে ধেনোর দলকে ধরে নিয়ে গিয়ে কথাটা ভেবেছিল সুমিত। ধেনো বলে—কাজতো করতে চাই। দেবে কে! তাই কোন পথ না পেয়ে চোলাই বেচি।

সুমিত বলে—কাজ তোকে দেব। টাকাও।

বেশ,—তার দলবলের সাহায্যেই সুমিত এখানের চোলাই

এর ঠেকগুলোয় টাকা দিয়ে বেশ কিছু আড্ডাকে ভেঙ্গে দিয়েছে। এরপর তার নজর গেছে রাতের অন্ধকারের ওই জীবদের দিকে।

সেই অন্ধকারের জীবদের প্রতি সুমিতের মনে একটা জাতক্রোধ রয়ে গেছে। ওদের হাতেই তার দাদা মারা গেছেন। পুলিশী তদন্তে সেই কথা না স্বীকার করুক, বিজয় দা ও এটাকে মেনে নিতে না পারলেও, সুমিতের দৃঢ় বিশ্বাস দাদাকে খুন করা হয়েছিল কৌশলে, আর সে কায ওই মীরচান্দানির মত লোকদের দ্বারাই হয়েছিল।

কিন্তু সার্চ করে সেই গুদামে অনেক বেআইনী মাল ও পাওয়া গেছে। কেস চলছে। ওদিকে রবার্টস্‌নের লঞ্চ থেকে পালাবার সময় ধরা পড়ার কেস তো আছেই।

সুমিতের হাতে রবার্টস্ এর কেসটা রয়েছে। লোকটার সম্বন্ধে কিছু খোঁজখবর যা পেয়েছে তাতে ওর গতিবিধি যে রহস্যময় সেটাই মনে হয়।

সুমিতের কাছে তাই নদীর ধারে রাতের মালপত্র আসার খবরটা আসতে মনে হয় এ সব যেন একসূত্রেই গ্রথিত। তাই সুমিত ও তৈরী হতে থাকে। ওদের ধরতেই হবে।

...মিঃ মালহোত্রা, মীরচান্দানি মিঃ পেরেরার দল এবার কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। ওদের পেছনে ছিনে জোকের মত লেগেছিল অমিত রায়।

তাকে ওরা কৌশলে শেষ করেছে। মিঃ পেরেরা সেদিন হঠাৎ ওই সুযোগটাকে কাযে লাগিয়ে বেশ জব্বর ফয়দা উঠিয়েছে।

মিঃ মালহোত্রা বলে—ওয়েল ডান পেরেরা। ওই অমিত টাকে সরিয়ে দারুণ একটা কায করেছো। আর গোপালবাবু আপনাকে ও ধন্যবাদ দিই কাগজে প্রথম এ্যাকসিডেন্টের খবর বলে ওটাকে ছেপেছিলেন।

গোপালবাবুর কাগজ এখন ওদের সাহায্যে দৈনিক কাগজে পরিণত হয়েছে। ফলে গোপালবাবুর দল ও খুব খুশী। নির্ভিক নিরপেক্ষ পত্রিকা বলে এর মধ্যে দলের মুখপত্র হয়ে উঠেছে। আর একটা কাগজ হাতে পেয়ে এখন গোপালবাবু ও ওই মহলে বেশ নাম কিনেছে। তাবড় মন্ত্রীরা, পুলিশের কর্তারা অবধি তাকে সমীহ করে চলে।

গোপালবাবু বলে নজরটাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। তাই দিয়েছি।

মালহোত্রা বলে—ভেরিগুড্। এবার আমার বস্তিটাকে তুলে দেবার ব্যবস্থা করো গোপালজী। অমিত রায় ও নেই। এখন তো লাইন ক্লিয়ার।

মীরচান্দানি বলে—তা সত্যি। তাই মালপত্র কিছু আসছে। কিন্তু অমিত রায় মরে ও ঝামেলায় ফেলে গেল মালহোত্রাজী, বহুৎ মাল পুলিশের হাতে চলে গেল। কেসভি হয়ে গেল।

মিঃ পেরেরা বলে—ফিকির মৎ কিজিয়ে মীরচান্দানিজী, মাল যো গিয়া উসসে জ্যাদা মাল ফিন্ আগিয়া। আউর ভি আসবে। লাইন ইজ নাও ক্লিয়ার। রুখনে বালা কোই হ্যায় নেহি। আজ ভি মাল আয়েগা।

মীরচান্দানির মিঃ মালহোত্রাদের লোকসান তেমন কিছুই হয়নি। যা মাল সিজ করেছে পুলিশ এখন তার থেকে অনেক বেশী মাল আসছে। তেলের দেশগুলো থেকে আসছে চোরা চালান হয়ে সোনাও।

আর নিশ্চিন্তে আছে তারা। গোপালবাবু বলে—এবার মিঃ মালহোত্রাজীকে পলিটিক্স এ ভি নিয়ে আসবো। দরদী দেশ সেবককে চাই মিনিষ্টার ভি করে দিব।

মালহোত্রা সাবধানী লোক। ওর চোরাচালান আসে প্রধানতঃ সোনা হীরা জহরৎ। বার্মা থেকে আসে রুবি এই সব দামী জিনিষ

পত্র। আর দেশের মধ্যে দু চারটে বড় বড় কারখানা চলে, তার জন্য প্রচুর কাঁচামাল আসে বিদেশ থেকে, তার অনেকটা গোপনে বিক্রী করে ও প্রচুর লাভ হয়। এছাড়া আছে পাটকল। বিদেশের বাজারে তার মিলের গ্যানি স্যাক জুট কার্পেট ব্যাক এসব যায়, এখানে কম দেখিয়ে সে সব মাল আণ্ডার ইন্ ভয়েস করিয়ে পাঠানো হয় সেখানে নায্য দামে বিক্রী হয়ে বাকী টাকা আর দেশের বিদেশী মুদ্রায় জমা হয় না।

সে টাকা সুইস্ ব্যাঙ্কের বিশেষ কোড নাম্বারে জমা হয়ে যায়। আবার ও দেশ থেকে দামী জুট মিল মেসিনারী, আর কটন মিল, ইন্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরীর মাল চড়া দামে এখানে আসে, বেশ কিছু টাকা আবার সুইস্ ব্যাঙ্কে জমা পড়ে।

মিঃ মালহোত্রা জানে নিজে ওসব রাজনীতির ঝামেলায় না গিয়ে ও কিছু টাকা খর্চা করে রাজনীতির দাদাদের দিয়ে নিজের সুবিধামত কায করানো যায়।

তাই মিঃ মালহোত্রা বলে—

মারচান্দানিকে বরং লাগাও গোপালজী, আমার ওসব আসে না। ব্যবসাদার মানুষ ব্যবসা বুঝি। তুমি বরং এই ফাঁকে তিন নম্বর বস্তিটাকে সাফ করার চেষ্টা করো। ওখানে মাল্টি ষ্টোরিড বিলডিং হবে, বাজার হবে। সারা এলাকার উন্নতিহবে।

গোপালবাবু চাইল। তা সত্যি কিন্তু—

এবার কিন্তুর মানে বোঝে মালহোত্রীজী। সে বলে—তোমার একটা ফ্ল্যাট থাকবে ওখানে। যে নামে বলবে আমি ডিড করে দিব।

একটা ফ্লাটের দাম নিদেন দু আড়াই লাখ টাকা। গোপালবাবু এবার একটু আগ্রহী হয় বলে সে।

—ওখানে সাথে সাথে একটা চ্যারিটেবল ডিসপেনস্যারি করবেন বলে দেন।

মালহোত্রা বলে—তার তো অনেক খরচ। ওর ওষুধ পত্র, হাসপাতে

গোপালবাবু। বলে সে—আরে সাচ মুহ করবেন নাকি? তবে পয়লা একটা ভিত্তি প্রস্তব স্থাপন উৎসর করে ধরুণ কোন পাবলিক লীডারকে আনবো। মিটিং হবে ফটো উঠবে—

তারপর বস্তি উঠে গেলে আর ওই ডাক্তারখানায় আসতে কেউ থাকবে না ওখানে। বুঝলেন না?

এবার বুঝেছে ওরা। হাসছে মালহোত্রা

হ্যাঁ। তুমি পাকা ব্যবসাদার আছে গোপালজী।

গোপালবাবু ও অমিত মারা যাবার পর একচালান মেয়েকে বিদেশে পাঠিয়েছে। ভালো পয়সা পেয়েছে সে বলে—আপনার দয়াতেই তো ব্যবসা করছি মিঃ মালহোত্রা। এখন লাইন ক্লিয়ার। আপনাদের ব্যবসা তো রম রম চলছে। আমার আর একটা লট বাইরে চালান করে দিন। ভেরি গুডলুকিং গার্লর্স আছে এই লটে।

মিঃ মালহোত্রা বলে—দেখি, এবার জাহাজে প্যাসেজ বুক বড় করাতে হবে। প্লেনে পাঠালে খর্চা বেশী হয়ে যায়।

গোপালবাবু বলে—মাল গাড়িতে পাঠান তাতে ও আপত্তি নাই মিঃ মালহোত্রা। তবে পাঠান। কিছু মা লক্ষ্মী ঘরে আসুক।

...রাত্রি নামছে। ওদের হাতে দামী কাঁচের গ্লাশ। তাদের সেই প্রধান ডেরায় ওয়ারলেসে কোডে মেসেজ এসেছে আজ প্রচুর মালপত্র আসছে। সেগুলো নদীর ওদিকের নির্জনে নামিয়ে ওরা গোপনে গুদামে তুলবে।

মিঃ মালহোত্রাজীর সোনা ও বেশ কিছু ডায়মণ্ড ও আসছে।

ফোনটা বেজে ওঠে। মালহোত্রা ফোনটা ধরে চমকে ওঠে। হোয়াট! পুলিশ টের পেয়ে রেড করেছে, গুলি চালিয়েছে। সব মাল আনতে পারেনি। ওয়ার্থলেস ফুলস্? রবাটসন্ কোথায়?

তাকে পালাতে দেখেছে ওরা। তারপর আর খবর পায়নি এখনও। ব্লাডি ফুলস্। সাচ ফর হিম।

ওদের আনন্দের তুফানে এবার নিরানন্দের ছায়া নামে। মালহোত্রাজী ফোনটা নামিয়ে বলে—পুলিশ মালুম পেল কি করে? আর রেড করে দিল? রবার্টসন্ কে পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ গুলি ভি চালিয়েছে।

সর্বনাশ! চমকে ওঠে মিঃ পেরেরা। বলে সে

—আবার কে এ সব সুরু করলো?

মালহোত্রা বলে—অমিত রায়দের অভাব হয় না পেরেরা, একজনকে মারবে অন্যজন এসে ঠিক আমাদের পিছনে পড়ে যাবে। খবর নাও আজকের রেড টা কে করেছে। আমার খবর ছিল ওই অমিত রায়ের ভাই ও পুলিশের অফিসার হয়েছে। খবর নাও সেই শয়তান এর পিছনে আছে কিনা?

…সুমিত এর কাছে খবরগুলো ঠিক এসে পেঁছে দেয় বিশের দল। তারজন্য বেশ কিছু টাকা ওরা পায়। ওরাই খবর আনে যে আজ রাতে কিছু লোকজন ঘোরাঘুরি করছে খাঁড়ির ধারে অন্ধকারে।

অমিত ও দলবল নিয়ে তৈরী ছিল আশপাশে। কিছু লোককে মেছো নৌকাতে জেলে সাজিয়ে ও রেখেছিল।

বেশ কিছু দিন ধরে এই চোরা চালান বেড়ে গেছে। পুলিশের সদর দপ্তর কলকাতার বিভিন্ন এলাকার বাজারে, এখান ওখানে রেড করে প্রচুর মাল ধরেছে। এখন ওসব অন্ধকারে চলে গেছে। মাল তবু আসার বিরাম নাই।

রাতের অন্ধকারে রবার্টসন্ লোকজন নিয়েতৈরী। নদীর দিক থেকে লঞ্চটা এসে ভিড়েছে ধারে। আলোগুলো নেভানো ছায়া মূর্তির দল অন্ধকারে মাল নামিয়ে ট্রাকে তুলছে। কিছু দিন থেকেই বিনা বাধায় ওরা রাশিরাশি মাল পাচার করেছে। তাই এবার সাহস বেড়েই গেছে।

রবার্টসন্ এর হাতে সোনা ডায়মণ্ড ভর্তি ব্রিফকেসটা। আসল মাল ওর হাতে আর সে তাড়া দেয়—জলদি করো ম্যান।

…বালিয়াড়ি দু একটা এদিক ওদিকে। অন্ধকারে সুমিত ও দলবল নিয়ে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ লঞ্চের আলোয় জায়গটা উলসে উঠতেই কে চীৎকার করে—পুলিশ! ভাগো।

ওরা দৌড়ে ট্রাকে ওঠার চেস্টা করে। সুমিতরাও এবার আক্রমণ শুরু করেছে। গুলি চালাচ্ছে ওরা একটা ট্রাকে লোকজন কিছু উঠে পালাবার চেষ্টা করে।

পুলিশ গুলি চালিয়ে সামনের টায়ারটা ফাঁসিয়ে দিতে ওরা ট্রাক ফেলে পালাবার চেষ্টা করে।

অন্য ট্রাকটা বের হয়ে যাচ্ছে, রবার্টসন্ ও বেগতিক দেখে ওই ট্রাকের পিছনে একটা দড়ি ধরে কোনমতে ট্রাকে ওঠার চেষ্টায় ঝুলছে সে বিপদজনক ভাবে। ও ভাবতে পারেনি যে পুলিশ অতর্কিতে এই ভাবে হানা দেবে। তাই ঠিক সাবধান হয়নি। পুলিশ ও সেই সুযোগই নিয়েছে।

সুমিত ও হেডলাইটের আলোয় ট্রাকে ঝুলতে ঝুলতে লোকটাকে পালাতে দেখে জিপ নিয়ে তাড়া করেছে। একটা ট্রাক ধরেছে তারা, এটাকেও ধরতে হবে।

রবার্টসন্ এর হাতটা আলগা হয়ে আসছে। আর ঝুলতে পারে না। পিছনে জিপটা ও তাড়া করে আসছে। গুলি চালাচ্ছে অন্ধকারে। একটা বুলেটের গরম আভাষ ওর রগ ঘেঁসে বের হয়ে যায়। আবার একটা গুলি—

রবার্টসন্ নিজেকে বাঁচাবার জন্যই বাঁকের মাথায় ট্রাকের গতিবেগ কমতেই নেমে পড়ে।

পুলিশ ট্রাকটাকেই তাড়া করবে, সে দামী মাল নিয়ে নিরাপদে বের হয়ে যাবে।

কিন্তু সুমিত লোকটাকে ট্রাক ছেড়ে ব্রিফকেস হাতে নিয়ে পালাতে দেখে লাফ দিয়ে পড়ে ওর দিকেই দৌড়েছে।

রবার্টসন্ ভাবতে পারেনি এভাবে তার পিছু নেবে। সেও পালাবার চেষ্টা করে, কিন্তু সুমিত তার চেয়ে বেশী জোরে দৌড়ায়। আরও শক্তিমান সে।

ধরা পড়ে যাবে। তবু মাল যেন পুলিশের হাতে না পড়ে এই ভেবে অন্ধকারে একটা পুকুরের মত খালের দিকেই ওটা ছুঁড়ে পালাচ্ছে রবার্টসন্।

তবু ওর পিছু ছাড়েনি সুমিত। ওদের দলের লোকদের ধরতেই হবে, বেশ কিছু দূর গিয়ে ধরেছে রবার্টসন্‌কে।

আর সেই ব্রিফকেস ও উদ্ধার করে। সেটার মধ্যে সোনার বিস্কুট এর প্যাকেট, দামী হীরাগুলোকে দেখে চমকে ওঠে সুমিত।

রবার্টসন্ বলে—টেক সাম। যা খুশী নিয়ে আমাকে যেতে দাও স্যার। এনিয়ে গোলমাল করোনা।

সুমিতের মাথায় যেন আগুন জ্বলে ওঠে ওই'সব কথা শুনে একটা জোরালো থাপ্পড়ে রবার্টসন্‌কে থামিয়ে দিয়ে বলে সুমিত——নিয়ে চল এটাকে থানায়। তারপর দেখা যাবে।

রবার্টসন্ ভাবতে পারেনি এতদূরে তার বাড়ির কাছাকাছি তাড়া করে এনে ওই ছোকরা পুলিশ অফিসার তাকে এভাবে ধরবে। ওইসব কথা বলার জন্য এই ভাবে এনে থানায় তুলবে!

খবরটা এর পরই পৌঁছে যায় মালহোত্রার কাছে। রবার্টসন্‌কে তাড়া করে গিয়ে পুলিশ ধরেছে, আর কয়েক লাখ টাকার সোনা হীরা ও ধরা পড়েছে।

আর এসব ধরা পড়েছে নোতুন পুলিশ অফিসার সুমিত রায়ের হাতে। তারই নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী আজ হানা দিয়ে প্রচুর মালপত্র, সোনা হীরার চোরা চালানী মাল আটক করেছে।

মিঃ মালহোত্রা গর্জে ওঠে—দেখলে ? বলিনি অমিত রায়ের ভাই এবার আমাদের পিছনে লেগেছে।

পেরেরা বলে—দরকার হলে ওকে ও

মীরচান্দানি ও ভাবছে কথাটা। কিন্তু মালহোত্রা বলে।

—একে এত সহজে জালে পাবেনা পেরেরা। ও দাদার খুনের বদলা নেবার জন্য ঘুরছে, তাই ও আর ও কঠিন। এখন রবার্টসন্‌টাকে ছাড়াতে হবে। আগেকার কেস তো চুকে গেছে।

আবার বিজয় সেনকেই স্মরণ করে তারা।

সকালে বিজয় লাইব্রেরীতে বসে কাগজগুলোয় চোখ বুলিয়ে নেয় চা খেতে খেতে। তার চোখে পড়ে সুমিতের ওই খবরটা। তরুণ পুলিশ অফিসার সুমিত রায়ের কৃতিত্ব। রাতে হানা দিয়ে প্রচুর মালপত্র, আর পাঁচ লাখ টাকা দামের সোনা, হীরার চালান ধরেছে। একটা চক্র গোপনে এই সব করছে।

লেখা বলে—দেখবে সুমিত খুব নাম করবে। সত্যিকার সৎ ভালো ছেলে।

রেবাও এই কৃতিত্বে খুশী হয়।

বিজয় লাইব্রেরীতে কাযে ব্যস্ত। মিঃ মালহোত্রাকে আসতে দেখে চাইল। ওর বড় মক্কেল। শহরের নামী দামী লোক। মীরচান্দানি, গোপালবাবুদের দেখে বলে কি ব্যাপার ! আসুন !

গোপালবাবু বলে—আমার মহিলা আশ্রমের বার্ষিক উৎসব. সেবার যেতে পারেননি, এবার যেতেই হবে। রাজ্যপাল পুরস্কার বিতরণ করবেন। তাই নেমতন্ন করতে এলাম। মালহোত্রাজীকে প্রেসিডেন্ট। তাই ওকে ভি আনলাম।

বিজয় কার্ডখানা নিয়ে বলে—যাবার চেষ্টা করবো।

—না, না। যেতে হবে।

এর মধ্যে চা এসে গেছে। মালহোত্রা আজকের কাগজের খবরটার জের টেনে বলে।

—কি দিন কাল হয়ে গেল বিজয়বাবু। এত টাকার মাল ধরেছে পুলিশ। তাহলে বুঝুন কত টাকা খাটছে অন্ধকারে? ওই টাকার কিছুটা ইনডাস্ট্রিতে পেলে দেশকে নয়া কায়দায় গড়ে তুলতে পারতাম। পুলিশ ঠিক করেছে ওইসব পাকড়ে।

বিজয় ও এটা ভাবে। মালহোত্রা ওঠার সময় বলে।

—মীরচান্দানির অপিসের কেয়ারটেকার রবার্টসন্‌কে পুলিশ ঝুটমুট হয়রানি করছে বিজয়বাবু। ফিন কালরাতে ওর বাড়ির সামনের ময়দান থেকে এ্যারেষ্ট করে এবার জব্বর চার্জ এ ফেলেছে। পুওর ম্যান—একটু বাঁচান! মীরচান্দানি ভি সব বলবে আপনাকে। চলি বিজয়বাবু। নমস্তে।

দেশসেবক গোপালবাবুও বলে—এখন খুব কাযের চাপ। এতবড় ফ্যাংশন। চলি বিজয়বাবু। মিসেস কে নিয়ে যাবেন কিন্তু।

মালহোত্রা, গোপালবাবু প্রকৃত দেশসেবক সেজেই বের হয়ে গেল। বিজয়বাবু তখন মীরচান্দানির মুখে নিরীহ রবার্টসনের হয়রানির কেস শুনছে।

বিজয় বলে—মিঃ মীরচান্দানি, ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য এসে রোগের ইতিহাসটাকে চেপে রাখবেন না। যা ঘটেছিল সত্যি কথা বলবেন, আমাকে বিশ্বাস করে। তবেই কিছু করতে পারবো। তাই সবকিছু জানা দরকার।

মিঃ মীরচান্দানি চাইল বিজয়ের দিকে। বিজয় বলে

—ইউ ক্যান বিলিভ মি!

পুলিশ কমিশনার নিজেও আজ খুশী হয়েছেন সুমিতকে এতবড় একটা কেস ধরতে। মাল পাওয়া গেছে একটা লরীর। অন্য লরীটা পালিয়ে যেতে পেরেছে, তার নাম্বার প্লেটেও বাজে। সুতরাং ধরা

যায় নি। আজ দলের পাণ্ডাদের পাত্তা অবশ্য মেলেনি। লক্ষ লক্ষ টাকার মাল হারিয়েও তারা এখন চুপ করে থাকবে।

ধরা পড়েছে কিছু কুলি, তাদেরও আনা হয়েছে থানায়। তাদের কাছে কোন খবরই বের হয়নি। আর ধরা পড়েছে ঘটনা স্থল থেকে দূরে রবার্টসন্। তার ওদিকের একটা থানার মধ্যে পাওয়া গেছে ওই ব্রিফকেস ভর্তি সোনা, হীরা এইসব।

...পুলিশ কমিশনার বলেন।

—এত বড় চক্রের পিছনে যারা আছে তাদেরও ধরতে হবে সুমিত। ওই মাল কোথায় যাচ্ছিল সেটা জানতে পারলে কাব হতো।

সুমিত বলে—একদিন ধরা পড়বেই স্যার।

সুমিত বলে—যারা ধরা পড়েছে নিশ্চয় ওদের পুরোনো লোক। তাদের কাছ থেকেও কিছু খবর বের হতে পারে।

কমিশনার সাহেব বলেন—চেষ্টা করো। বেষ্ট অব দি লাক্।

...সুমিত আদালতে আসামীকে হাজির করেছে। সরকারী উকিলকেও কেসের বিষয় বলে জানায়—জামিন দেওয়া চলবে না। জামিনে বের হলেই ওদের কেস ভেস্তে যায়।

সরকারী উকিল বলে—তাই বাধা দেব আমরা।

রবার্টসন্‌কে হাজির করা হয়েছে। আর ওদিকে উকিল দিয়েছে বিজয়বাবুকেই। সুমিত এর আগেও লেখাবৌদির কাছে শুনেছ বিজয়দা দাঁড়িয়েছে আসামী পক্ষে।

সরকারী উকিল জামিন দিতে বিরোধিতা করেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এতবড় চোরাচালান চক্রের সঙ্গে জড়িত সে।

কিন্তু বিজয় বাধা দেয়—ইয়োর অনার। আমার বন্ধু ধৃত মিঃ রবার্টসনের সমন্ধে যা বলেছেন তা কল্পনা প্রসূত—অসত্য। মিঃ রবার্টসন্ যদি ওই চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকতো তাহলে মাল

বাড়িতে আনতো না। তাছাড়া মাল ওর হাতেও পাওয়া যায়নি। মাল পাওয়া গেছে অন্যত্র। নয় কি অফিসার?

সুমিত এখন তার স্নেহভজন কেউ নয়, পুলিশ অফিসার মাত্র। বিজয় বলে—জবাব দিন?

কথাটা সত্যি মাল পাওয়া গেছে বেশ দূরে। ঘাড়নাড়ে সুমিত। বিজয় বলে—

মাল আর কেউ ফেলে পালাতে পারে, আর রবার্টসন্ তার বাড়ির সামনে সেই সময় ছিল, তাকেই প্রকৃত আসামীর বদলে ধরে এনে এই চার্জে যে জড়াননি এ কথাও অস্বীকার করা যায় না।

সরকারী উকিল প্রতিবাদে করে না! পুলিশ ওকে তাড়াকরে ধরে। বিজয় বাবু বলে

রবার্টসন্ যদি মাল নামানোর সময় ঘটনা-স্থলে থাকতো, এই ধরা পড়া কুলিরা নিশ্চয়ই তাকে চিনতো। তোমরা কেউ চেনো ওকে? দেখেছিলে নদীর ধারে?

ওরা জানায়—না হুজুর।

বিজয় এবার রুখে ওঠে—দেখুন ইয়োর অনার! ওদের এ অভিযোগ সর্বৈব অসত্য, এরা রবার্টস্‌কে চোন না, মাল ও রবার্টস্ এর হাতে পাওয়া যায়নি, ওকে ধরা হয়েছে ওর বাড়ির দরজা থেকে। সুতরাং তার বিরুদ্ধে যখন সঠিক কোন চার্জ আসছে না তাকে জামিন দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে পবিত্র আইনের মর্য্যাদা পালন করা হোক এই প্রার্থনা।

আদালত চুপ করে বিজয়ের উদাত্ত কণ্ঠের সওয়াল শুনছে। রবার্টস্‌নের জামিন ও হয়ে গেল।

সুমিত চুপ করে দেখছে। সেই রাতের কথাটা সে ভোলেনি। নিজে দেখেছিল রবার্টসন্‌কে ও ঘটনাস্থলে মাল নামানোর কাযে তদারক করতে, সেখান থেকে তাড়া করে এতদূর গিয়ে ধরেছিল।

তাই বৈকালে বিজয়ের বাড়িতে এসেছে সুমিত। ওর মনে নীরব একটা ক্ষোভ রয়ে গেছে। বিজয় ওকে দেখে বলে—এসো সুমিত।

লেখা ও চা এগিয়ে দেয়। সুমিত বলে—

তোমার কথা সত্যি বৌদি। এতকষ্ট করে গলির মুখে পড়ে এক ব্যাটাকে তাড়া করে জিপ নিয়ে এসে ধরলাম, ব্যাটা মাল ফেলে পালাচ্ছিল, কিন্তু বিজয়দা ওকে জামিনে বের করে দিল।

লেখা বলে -ও দেবেই। ওই ওর কায।

সুমিত বলে—কিন্তু কাযটা আসলে ঠিক নয় বিজয়দা, ওরা বার বার ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। সেবার ও দাদার হাত থেকে ওকেই ধর্মপ্রাণ চার্চগোয়ার বলে প্রমান খাড়া করে ছাড়িয়ে ছিলেন। ওই লোকটা কি যখনই এমনি ঘটনা ঘটে হাজির হয় সেখানে, কেন?

বিজয় বলে—কিন্তু আইনের কাছে ও দোষী প্রমানিত হয়নি।

—কিন্তু ও দোষীই সচক্ষে দেখেছি।

সুমিত বলে—

বিজয় জানায় তুমি আইনকে দেখাতে পারোনি।

সুমিত বলে এই ভাবে ওদের ছেড়ে দিয়ে সমাজে ক্রাইমের সংখ্যাই বাড়ছে বিজয়দা, ওরা ও সাহসী হয়ে উঠছে। একদিন ওরা আপনার আমার উপর ও হাত তুলবে, আর আইনকে কিনে নিয়ে ওরা আবার ছাড়া পেয়ে ও যাবে।

আর ওদের পিছনের কোন ধনীর দল ওদের দিয়ে নিজেদের পুঁজিই বাড়াবে। তাহলে ওই রবার্টস্ এত গুন টাকা পায় কোথায়?

বিজয় ও কিছুটা ভাবতে পারে। কিন্তু নিজে আইনজ্ঞ হয়ে দেখেছে আইন এক জায়গায় অন্ধ, সেখানে তার সীমা ও সীমিত হয়ে গেছে। কোন অর্থ প্রতিষ্ঠার কঠিন দেওয়ালে বাধা পেয়ে। সেখানে প্রতিবাদের বাণী নিরব হয়ে যায়, বিচারের হাত সেখানে

পৌঁছে না। ধর্মাধিকরণের তৌল দণ্ডের মান সেখানে অন্য দিকেই ঝুঁকে থাকে। সমান তৌলে আসে না। সুমিতের প্রতিবাদ সেইখানেই। অমিত ও এই প্রতিবাদ করে আর ও এগিয়ে যেতে চেয়েছিল তাকে শেষ হয়ে যেতে হয়েছে। কোন ন্যায় বিচারে ওতার বিচার করা সম্ভব হয় নি।

বিজয় এর মত আইনজ্ঞের আইনজ্ঞান ও সেখানে সংকুচিত।

লেখা বলে—ওই সব কোর্ট কাছারির কচকচি ছাড়ো তো। সুমিত ভাবছি ক'দিন কার্সিয়াং এ ঘুরে আসবো। ওখানে তোমার দাদা একটা বাংলো কিনেছে, আমাদের যাওয়া হয়নি। ভাবছি সামনের শনিবারই যাবো।

রেবা যেন এসবে আগ্রহী নয়। সে একটা সোয়েটার বুনে চলেছে।

বিজয় বলে ওঠে—সুমিত, তুমি ও চল। কাযতো করছোই দুচারদিন ছুটি নিয়ে নাও।

লেখা খুশী হয়, বলে সে—তাহলে খুব ভালো হয় সুমিত। তুমি সঙ্গে থাকলে ভরসা পাই।

বিজয় বলে—তা সত্যি। রিভলভার ধারী একজন ইয়ং আই পি এস কে বডিগার্ড পেলে ভালোই হয়। তাহলে চল সুমিত।

সুমিত কি ভাবছে। রেবার দিকে চাইল। রেবা আর সে ক'দিন ওই বন পাহাড়ে কি আনন্দময় দিন কাটিয়েছে। আবার যেন রেবার চোখে নীরব সেই আমন্ত্রণ দেখেছে সুমিত।

তার ও মন চায় এই একঘেয়েমির জীবন থেকে ক'দিনের জন্য মুক্তি পেতে। সুমিত বলে।—ঠিক আছে ছুটির জন্য দেখছি।

লেখা বলে—দেখা দেখি নয়, যাচ্ছো। শনিবার ভোরে বের হলে সন্ধ্যার আগেই বাংলোয় পৌঁছে যাবো। খুকি ক'দিন ওর দিদার কাছে যাচ্ছে, স্কুল বন্ধ। এই সময়ে যেতে না পারলে ওর স্কুল খুলে যাবে আমাদের যাওয়াই হবে না।

সুমিত স্বপ্ন দেখছে সে আর রেবা ফিরে গেছে সেই বন পাহাড়ের রাজ্যে। বাগানে সন্ধ্যার আবছা আলো আধাঁরের মাঝে রেবা আর সুমিত যেন হারিয়ে গেছে।

রেবা বলে—দারুণ হবে। কিন্তু আর তেমনি করে বাইরে পালানো হবে না কিন্তু।

সুমিত রেবার হাতখানা তুলে নিয়ে বলে—তুমি ভরসা দিলে আমি রাজী আছি।

—ধ্যাৎ! রেবা হাসছে। হাসলে ওকে সুন্দর দেখায়। সুমিত ওর দিকে চেয়ে থাকে। তারার আলোর ঝিলিক জাগে ওর ডাগর চোখে।

রেবা বলে—বিয়ের আগে আর তোমার সঙ্গে ও ভাবে বেরুবো না।

—কেন? সুমিত চাইল। রেবা কৃত্রিম কোপে বলে ওঠে যা দুষ্টু। বাবাঃ!

কেন? সেই রাত্রে দুষ্টুমি তো কিছুই করিনি ম্যাডাম। রেবা বলে—করোনি আমার ভাগ্যি। কিন্তু করতে কতক্ষণ? পুরুষদের আমি বিশ্বাস করি না।

সুমিত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—সারা পুরুষ সমাজেরই এটা পরম দুভাগ্যের পরিচয় দেবী।

হাসছে রেবা। বলে।—তাহলে যাচ্ছো কিন্তু।

সুমিত ও যাবার কথা ভাবছে

বিজয় এর ক'দিন কেসের চাপ কম, শনিবার এর দুটো কেস পরের সপ্তাহের কেস গুলো জুনিয়ারদের বুঝিয়ে দিচ্ছে। দরকার হলে দু'একটা জরুরী কেসে তারা ডেট নেবে। বিজয় ফিরে এসে সামলাবে।

গনেশ গোঁসাই মনে করিয়ে দেয়।—শনিবার রবার্টস্ এর কেস আছে স্যার।

বিজয় বলে—ওটা জুনিয়ার দত্তকে বলে যাবো সামলে নেবে। দরকার হয় ডেট নেবে।

গনেশ গোঁসাই বলে—তাহলে ঠিকই আছে। কদিন কেটে যাবে।

রবার্টসন্ এর কেসটাকে সরকার ও গুরুত্ব দিতে চায়। পুলিশ কমিশনরের ও মনে ধারণা হয়েছে এই স্মাগলিং এর কেসটার সঙ্গে অনেকেই জড়িত। রবার্টসন্ এর কেসটার আর ও গভীরে তদন্ত হওয়ার দরকার। লোকটাকে শাস্তি দিতেই হবে।

সামনের শনিবার কেসটা উঠবে। সুমিতকে ঢুকতে দেখে চাইলেন তিনি—এসো সুমিত।

সুমিত এসেছে তার ক'দিনের ছুটির ব্যাপারে, একটু ঘুরে আসবে সে পাহাড় অঞ্চল থেকে। কথাটা জানাতে পুলিশ কমিশনার বলেন

—কিন্তু এই শনিবার রবার্টসন্ এর কেস উঠবে। আমি চাই ওই কেসটা অন্ততঃ এ্যাটেণ্ড করে যাও। তুমিই ওটার তদন্ত করছো।

সুমিত বলে—কেস পাবলিক প্রসিকিউটারকে বুঝিয়ে দিয়েছি স্যার। ওতে আমার আর করার কিছু নেই। আর মনে হয় ওরা ডেট নেবে।

কমিশনার বলেন—ওদের বিশ্বাস নেই সুমিত, তবু যদি কোন দরকার হয় এখানেই থেকে যাবে তুমি। শনিবার এ কেসটার পর ইউ ক্যান টেক্ লিভ।

ডিসিপ্লিন মেনে চলতেই হয় এখানে। সুমিত তাই বলে—ওকে স্যার। তাই হবে।

—থ্যাঙ্ক ইউ!

খবরটা ঠিক কোন রন্ধ্রপথে মালহোত্রা মীরচান্দানির ডেরাতেও পৌঁছে যায়। রবাটসন্‌কে পুলিশ যেভাবে হোক আটকাবেই, কিন্তু তাহলেই এদের বিপদ ঘটতে পারে।

ওরা চায় রবার্টস্‌কে খালাস করে এনে এখান থেকে অন্য ঘাঁটিতে সরিয়ে দোব। দরকার হয় চিরদিনের জন্য দুনিয়া থেকেই সরিয়ে দেবে। তাই তাকে খালাস করা দরকার।

মীরচান্দানি নিজে এসেছে বিজয়ের কাছে।

বিজয় শনিবার সকালেই বের হবার ব্যবস্থা করেছে। কতদিন পর এই ছুটি নিচ্ছে সে। তার মনেও কয়েকদিনের জন্য মুক্তির আস্বাদ মেলে।

মীরচান্দানির কথায় বলে বিজয়।

—ও কেস দত্ত সামাল নেবে। ওকে বুঝিয়ে দিয়েছি। ও ঠিক খালাস করে আনবে। গ্রাউণ্ড, আর্গুমেণ্ট সব বলে দিয়েছি।

কিন্তু মীরচান্দানি বলে—তবু আপনি একটা দিন থেকে যান বিজয়বাবু, এইসব করিয়ে যান, ফার্ষ্ট কেস উঠবে এইটা। আপনি সকালে না বের হয়ে দুপুরেই বের হয়ে যান, প্লিজ।

একটা দিন থেকে যান।

লেখা আর রেবা বের হবার জন্য গোছগাছ প্রায় শেষ করে ফেলেছে। তনুশ্রী চলে গেছে ওর দিদার কাছে। তবু লেখাকে সংসার ফেলে বের হতে হচ্ছে তার ঝামেলাও কম নয়।

হরিপদকে বুঝিয়ে দিতে হবে সবকিছু।

রেবা স্যুটকেশ গোছানো শেষ করেছে, লেখা বলে।

—ঠাণ্ডা পড়বে, শাল সোয়েটার নিয়েছিস তো?

বিজয়কে ঢুকতে দেখে চাইল লেখা। সে বলে—তোমার স্যুট তিনটে নিলাম, কাল ভোরেই বের হও—

বিজয় বলে—একটু গোলমাল হয়ে গেছে লেখা।

লেখা চাইল ওর দিকে।

বিজয় বলে—তেমন কিছু না, কাল ভোরে বের হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। একটা জরুরী কেস পড়ে গেছে। পরশু সকালেই বের হবো।

লেখা রেগে ওঠে। শেষ সময়ে বিজয় যে এমনি কথা বলবে তা জানতো না। বলে সে—তার চেয়ে বলো গিয়ে আর দরকার নেই। গোছগাছ করলাম, সব রেডি—

বিজয় জবাব দেবার চেষ্টা করে—মানে, একদিন পরে যাচ্ছি—

সুমিতকে ঢুকতে দেখে লেখা বলে।

—সুমিত, তোমার দাদা শেষ সময়ে এমনি বাগড়া দেবে ত। জানতাম, ও যায় যাক, না যায় না যাক। কাল ভোরেই আমরা বের হচ্ছি।

সুমিত তার নিজের অসুবিধার কথাটা জানাতে এসেছে।

বৌদির কথায় সে বলে—কিন্তু আমারও একটা Problem হয়ে গেছে বৌদি।

লেখা চাইল—তোমারও প্রবলেম হয়ে গেল ?

সুমিত বলে—কাল জরুরী একটা কেস আছে। কমিশনার সাহেবের অর্ডার ওই কেসটা দেখে তারপর ছুটি পাবো।

লেখা বলে—অর্থাৎ তোমারও সকালে যাওয়া হবে না। ঠিক আছে। সুটকেশপত্র খুলে ফ্যাল রেবা। আর গিয়ে কাজ নেই। ওরা চোর ডাকাত স্মাগলার নিয়েই ঘর করুক, আমরা যা করছি করি। যাবো না আর।

রেবা এতক্ষন চুপ করে ছিল।

বলে সে—বৌদি। গোছ গাছ করেছি যখন তখন আর কেউ যাক না যাক, আমরা দুজনেই যাবো। ওপথ আমি ভালো করে চিনি। ভোরে বেরুলে সন্ধ্যার আগেই পেঁৗছে যাবো।

বিজয় এবার বলে।

—বেশতো। তোরা সকালেই বের হয়ে যা। আমি সুমিত কাল ভোরে কাজ সেরেই যত তাড়াতাড়ি পারি বের হয়ে যাবো। পথের শেষ দিকে ধরে ফেলবো তোদের।

লেখা কি ভাবছে।

রেবা বলে—তাই চলো বৌদি। গোছ গাছ করেছো, এই ভাবেই বেরহই আমরা।

সুমিত বলে—তাই যান বৌদি। আমরা পিছুপিছু চলে যাবো মামলা চুকিয়ে।

মামলার ফল কি হবে তা বিজয় জানতো। রবার্টসনের জামিনের সময়ই সে তাকে বের করার পথ করে রেখেছিল। মাল যে ওর হাতে ছিল তারও কোন প্রমান নেই। হাতের দাগ খানার জল কাদাতে মুছে গেছে। আর ওর বাড়ির কাছেই ধরেছে ওকে। গোলমাল শুনে বেরহয়ে এসেছিল, পুলিশ আসল আসামী পালিয়ে যেতে ওকেই ধরে ফেলে।

সরকারী উকিল প্রতিবাদ করেন।

বিজয় ও আইনের ধারা তুলে তর্ক সুরু করে। শেষ অবধি জিতে যায়। রবার্টসনকে খালাস করে নিয়ে যায় মীরচান্দানি, মালহোত্রাও এসেছিল। ওর গা বেচেছে কিন্তু এতটাকার মাল চলে গেছে।

বিজয় আর সুমিত বের হয়েছে কোর্ট থেকেই।

সুমিত তখনও আদালতের কথাটা ভুলতে পারেনি। ক্রমশঃ সুমিতও জেনেছে মীরচান্দানি, মালহোত্রা মিঃ পেরেরাদের। না ওদের বাইরে থেকে ধরার উপায় নেই।

সমাজের সুপরিচিত, প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ওরা।

সব জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত, আন্তর্জাতিক ক্লাবের সভ্য, আর কর্তাদের সঙ্গে ওদের প্রায় দেখা যায়।

কিন্তু রবার্টস্ এর মত লোককে তারা প্রশ্রয় দেয় কেন?

হাতেনাতে ধরেও ওকে ছেড়ে দিতে হয়েছে।

সুমিত বলে—ওই মালহোত্রা-মীরচান্দানিরা পরিস্কার লোক নয় বিজয় দা, রবার্টসনকে ওদের কিসের এত দরকরে যে তার জন্য এত করে?

বিজয় সে খবর জেনেও জানে না।

সুমিত বলে—ওই সব শয়তানদের বাইরে রেখে সমাজে শুধু অপরাধই বাড়াচ্ছিল। ভয় হয় ওরা শেষ অবধি আমাদের গায়েই না হাত দেয়? সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ওরা দুষ্ট ক্ষতের মত ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন আপনাদের মত আইনজ্ঞ কিছু ব্যক্তি!

বিজয় চুপকরে থাকে। সুমিতের রাগটা ক্রমশঃ কমে আসছে বাইরের জগতে এসে। দুদিকে সবুজ গাছ গাছালি, ক্ষেত। কোথাও ছোট নদী বয়ে চলেছে। প্রকৃতি অনেক বিশাল, শান্ত। সে আপনমনে তার কাজ করে চলেছে। সেখানে কোন জ্বালা নেই। সে যেন সর্বংসহা একটি সত্ত্বা যার লয় নেই ক্ষয় নেই। তার অপরিসীম শান্তির স্পর্শমাখা বিস্তারে এসে মানুষ নিজের তুচ্ছ দুঃখ কষ্টকে ও ভুলে যায়।

কিন্তু একশ্রেণীর জীব আছে প্রকৃতির সব অবদান তাদের কাছে ব্যর্থ হয়ে যায়। তারা তাদের নিজেদের চেতনার জগত নিয়েই থাকে সেখানে অর্থ-সম্পদ প্রতিপত্তি আর অন্য মানুষের সব কিছু কেড়ে নিজের দখলে আনার স্বপ্নটাই বড় কথা।

প্রকাশ মালহোত্রার ছেলে বিকাশ ও এর মধ্যে নায়েক হয়ে উঠেছে। বাইরে সে তাদের একটা কোম্পানীর ডিরেক্টার কাম ম্যানেজার। সেটা ওর একটা পরিচয় কিন্তু এ ছাড়াও বিকাশ ও এর মধ্যে তাদের অন্ধকারের কারবারে নেমে পড়েছে।

উত্তর বাংলার সীমান্তে পাহাড় এলাকা দিয়ে প্রচুর বেআইনী মালপত্র, হাসিস, গাঁজা মায় সোনার চোরা চালান আসে। এখানের কোন পার্বত্য ছোট শহরে ও তাদের একটা অফিস আছে। চা বাগান ও রয়েছে। এখানের ডেরা থেকেই এদিকের চোরা কারবার-টা চলে ঢালাও ভাবে। বিকাশ এই দিকের ব্যাপারটা দেখা শোনা করে। আসেও প্রায় এদিকে।

সেদিন বিকাশ ওর সঙ্গী একজন চন্দর নিয়ে ফিরছে কলকাতা। গাড়িতে বেশ কিছু সোনাও আছে।

পাহাড়ী আবহাওয়ার মর্জি বোঝা ভার, আকাশে মেঘ জমেছে।

চন্দর বলে—বরখাহবে বস্! এই সন্ধ্যার মুখে বের হবে?

বিকাশ এমনিতে বেপরোয়া। তাছাড়া জরুরী দরকার।

এত মাল এখানে রাখা নিরাপদ হবেনা। বিকাশ বলে।

—কোই ফিকির মৎ করো চন্দর। হম্‌লোগ, সিধা চলা যায় গা।

ওরা বের হয়েছে কলকাতার দিকে। চন্দর বলে।

—ঠিক হ্যায়।

ঝড় বৃষ্টি সুরু হয়েছে পাহাড় বন এলাকায়। ওরা বৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ী পথ বেয়ে নামছে। বিকাশ পিছনের সিটে বসে এর মধ্যে মদের বোতলে বের করেছে।

মৌজ করে ড্রিঙ্ক করছে সে।

লেখা রেবা দুজনে জেদের বশেই বের হয়েছে। লেখা ও ভালো গাড়ি চালায়, রেবা ও। লেখা এর আগে দু' একবার রোড রেসেও নাম দিয়েছে।

দুজনে চলেছে। বৈকাল নাগাদ কিশন গঞ্জ ছাড়িয়ে আসছে শিলিগুড়ির দিকে। বৈকালের আকাশে দেখা যায় কাঞ্চন জঙ্ঘার বরফ ঢাকা চুড়াটা, ধ্যান মগ্ন হিমালয়ের বিচিত্র সুন্দর মহিলাময় রূপটা চোখে পড়ে।

লেখা বলে-সন্ধ্যার আগেই পেঁৗছে যাবো।

পিছনে ওদের গাড়ি দেখছিস নাকি?

রেবা বলে—কই না তো। এসে পড়বে ঠিকই।

ওরা চলেছে।

শিলিগুড়ি ডাইনে ফেলে ওরা দার্জিলিং রোড ধরতে গিয়ে

বিপদে পড়ে। কাল থেকে বৃষ্টি নেমেছে পাহাড়ে। কোথায় ধ্বসও নেমেছে। গাড়ি বন্ধ।

তাই পাঙ্খাবাড়ি রোড দিয়ে উঠতে হবে।

ওই পথটা আরও নির্জন, রাস্তার চড়াই ও বেশী।

রেবা বলে—কি হবে বৌদি? বরং আমরা এখানেই অপেক্ষা করি। দাদারা এসে পড়লে একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

লেখা কিছুটা বেপরোয়া। বলে সে।

—ভয় কি? ও পথেও ঠিক চলে যাবো। এতদূর এসে ওদের জন্য দাঁড়াতে হবে না। ততক্ষণে কার্সিয়াং পৌঁছে যাবো।

লেখাই জেদকরে পাঙ্খাবাড়ির নির্জন পথ ধরে চলেছে। এবার বৃষ্টি ঝড়ও সুরু হয়। সমতলের চা বাগান এলাকা পাহাড়ের নীচের বসতি ছাড়িয়ে ওদের গাড়িটা ওই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে চলেছে নির্জন বন পাহাড়ের পথ ধরে।

এপথে গাড়ি এমনিতেই কম চলে, তারা এই দুর্যোগের রাতে কেউ বিশেষ বের হয়নি।

অন্ধকার রাত্রি, বৃষ্টির আস্বচ্ছ যবনিকা ভেদ করে হেড লাইটের আলোটা যেন এগোতে পারছে না। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকে পাহাড় বন এর রহস্যময় রূপটা একটু দেখা দিয়েই আবার হারিয়ে যায়।

হঠাৎ লেখার গাড়িটা থেমে যায়।

আবার বৃষ্টি চলেছে পাহাড়ের গাথেকে যেন জলস্রোত নেমেছে পথে।

রেবা বলে—কি হল বৌদি?

লেখা বলে—কে জানে বোধ হয় জল নেমছে কারবুরেটারে, দেখছি।

বর্ষাতিটা গায়ে চাপিয়ে টর্চ নিয়ে নামছে লেখা,

রেবাও নেমেছে ছাতা নিয়ে। দমকা হাওয়ায় ছাতা রাখা যায়

না। বৃষ্টির ঝাটে ভিজছে তারা। লেখাও বনেটটা খুলে টর্চের আলোয় দেখছে কোথায় কি গড় বড় হয়েছে।

হঠাৎ বাঁকের মাথায় দেখা যায় একটা গাড়িকে নামতে। ওই গাড়ির হেডলাইটের আলোয় দেখা যায় এদের দুজনকে। বৃষ্টিতে ভিজে গিয়ে পাতলা সিল্কের শাড়ি ওদের গায়ে বসেছে, মুখগুলো বৃষ্টির ছা'টে ভিজে কোমল সুন্দর হয়ে উঠেছে।

বিকাশ মালহোত্রার গাড়িটা নামছে। নির্জন পথ, বৃষ্টির মধ্যে এখানে দুটি মেয়েকে দেখে বিকাশ এর নেশালাগা চোখ দুটো জ্বলে ওঠে কি তীব্র লালসায়। বলে সে গাড়ি থামা চন্দর।

চন্দর চেনে মনিবকে।

বিকাশের স্বভাবের এর পশুটাকে চন্দরের মত অন্ধকারের জীবও ভয় করে।

বলে সে—দত্ত সাব্। মাল হ্যায় গাড়িমে। ঝামেলা মৎ করো জী।

বিকাশ ওর কথার উপর চন্দরজি কথা বলতে দেখে বলে কে। রোকো গাড়ি। বক্ বক্ মৎ করো।

গাড়ি থামাতে বিকাশ নেমেছে। দেখছে দুটি মেয়েকে। ধারে পাশে আর কেউ নেই। ওর মনের মধ্যে তখন ঝড় উঠেছে।

এগিয়ে যায় বিকাশ লোভী একটা জানোয়ারের মত।

—গাড়ি গড় বড় হো গিয়া?

বিকাশের কথায় চাইল লেখা। বলে সে হ্যাঁ।

বিকাশ বলে—এখানে গাড়ি থাকুক। এইবারে আমার গাড়িতে চলো শিলিগুড়ির হোটেলে থাকবে। কোনও অসুবিধা, অযত্ন হবে না। মাইরী—

রেবা দেখছে ওই তরুণটিকে। টলছে, মুখের মদের গন্ধ। রেবা বলে—আপনি যান এখান থেকে। যান—

বিকাশ চাইল। বলে সে—তাই নাকি। এ তোমার রাস্তা?

লেখা বলে—যাও। চলে যাও। নাহলে লোক ডাকবো। চীৎকার করবো।

হাসছে বিকাশ। মেয়েদের দেখছে সে। বলে ওঠে।

—এই ত্রিসীমানাতেও কেউ নাই। মকাইবাড়ির বাইরে এ জঙ্গলে পেয়ে তোমাদের ছেড়ে চলে যাবো? সোজাকথায় না গেলে—

লেখা বিপদের গুরুত্ব বুঝেছে। রেবাও চমকে ওঠে।

সেই মাতাল তরুণটা এগিয় আসছে তাদের চরম সর্বনাশ করতে। এই নির্জন বন পাহাড়ে ঝড় বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে ওদের চীৎকার শোনা যায় না।

লেখা ওই জানোয়ারটাকে থামাবার জন্যই তার হাতের রেঞ্চ দিয়ে বিকাশের কপালেই একটা ঘা মেরেছে। রক্ত ঝরছে। আর বিকাশও এবার আদিম হিংস্র জানোয়ারের মত ওদের উপর লাফিয়ে পড়তে চেষ্টা করে।

ওরা দুজনে দৌড়চ্ছে, কোথায় কোনদিকে যাবে জানেনা, লেখা রেবা এবার প্রাণ ভয়ে বনপাহাড়ের মধ্যে পালাতে চায়। বৃষ্টির জলে পিছল হয়ে উঠেছে পাহাড়ী পথ।

ওরা দৌড়াবার চেষ্টা করে, পিছু পিছু ছুটে আসছে ওই জানোয়ারটা। রেবা দৌড়চ্ছে, হঠাৎ পিছল পাথরে পা পড়তে তার দেহটা গড়িয়ে পড়তে পড়তে একটা ঝোপে আটকে যায়।

ঝড় বৃষ্টির মধ্যে লেখা পালাবার চেষ্টা করে, কিন্তু তার আগেই জানোয়ারটা ওর উপর লাফ দিয়ে পড়েছে। লেখা বাধা দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু একটা কি কঠিন আঘাতে ওর চোখের সামনে জমাট অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। স্তব্ধ হয়ে যায় সে।

বনপাহাড়ে তখনও সমানে বৃষ্টির শব্দ ওঠে। মেঘ গর্জে ওঠে। পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনি প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

বিজয় আর সুমিতও আসছে। পথে তারা লেখাদের গাড়িটা

দেখতে পায়নি। সুমিত বলে বোধ হয় এতক্ষণে পেঁছে গেছে তারা।

বিজয় এর ও তাই মনে হয়।

ঝড়বৃষ্টির মধ্যে জনহীন পাহাড়ী পথ দিয়ে উঠছে তাঁদের গাড়ি। হঠাৎ দূরে পাহাড়ের ধারে রাস্তার উপর তাদের গাড়িটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিজয় চাইল।

—আমাদের গাড়ি না?

সুমিত বলে—ওখানে গিয়ে দাঁড়ান, বোধহয় ওদের গাড়ি বিগড়ে গেছে এখানে।

গাড়িটা পাশে দাঁড়াতে সুমিত বলে ওঠে।

—বৌদি গাড়ি চালাতে জানেন গাড়ির মেজাজ বোঝেন না?

পড়ে আছেন তো?

কোন সাড়া নেই।

গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গিয়ে অবাক হয় সুমিত।

তার পুলিশী নজরে পড়ে গাড়ির চারিপাশের ব্যাপারটা। বনেট তখনও খোলা, টুল বক্স থেকে যন্ত্র পাতি ছড়ানো, গাড়ির দরজা খোলা, ছাতাটা উল্‌টে পড়ে আছে। গাড়ির আশপাশে ধস্তাধস্তির চিহ্ন রয়েছে।

কিন্তু লেখা, রেবা কেউ নেই।

সুমিত চমকে ওঠে—বিজয়দা! সামথিং রং। কাউকে দেখছিনা।

জিনিষ পত্র ছড়ানো, এরা গেল কোথায়?

বিজয়ও বেরহয়ে এসে দেখছে ব্যাপারটা। একটা ছোট খাটো ধস্তাধস্তির চিহ্নই রয়েছে। টর্চের আলোয় দেখাযায় পাশেই একটা গাছের উপর লেডিজ শাল—লেখার শালই পড়ে আছে। একপাটি জুতোও

বিজয় বলে—একটা কিছু ঘটেছে সুমিত।

ওরা টর্চের আলোটা ফেলে এদিক ওদিকে খুঁজছে।

ডাকছে নাম ধরে। ওদের ডাকটা পাহাড়ে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে।

কিন্তু কারোও কোন সাড়া নেই।

বৃষ্টি থেমেছে। স্তব্ধ পাহাড়ে ওদের ডাকটা শোনা যায়। খুঁজছে বিজয় আর সুমিত।

হঠাৎ সুমিতের টর্চের আলোয় নীচে দেখাযায় পাহাড়ের গায়ে পড়ে আছে রেবার দেহটা, মাথায় আঘাত পেয়ে রক্ত ঝরছে। সুমিত দৌড়ে যায় ওই দিকে।

হঠাৎ বিজয়ের চীৎকার কানে আসতে দাঁড়ালো সে।

দেখা যায়, ওপাশে একটা পাথরের উপর লেখার প্রাণহীন দেহটা পড়ে আছে। কাপড় চোপড় অবিন্যস্ত, সারা দেহে কোন নিষ্ঠুর পাশবিক অত্যাচারের চিহ্ন। নির্মম আঘাত আর অপমানে যেন লেখা এই পৃথিবীকে কি নিদারুণ ধিক্কার দিয়ে চিরদিনের জন্য চলে গেছে।

রেবা পড়ে গিয়ে সেই দস্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছল, কিন্তু রাতের অন্ধকারে সেই জানোয়ারটা লেখাকে নিষ্কৃতি দেয়নি, মৃত্যুই লেখাকে চরম গ্লানির হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে।

বিজয় চীৎকার করে—এ কি সর্বনাশ হ'ল সুমিত!

এ আমি ভাবতে পারছি না।

কোন অন্ধকারের জীব বিজয়ের সুখের সংসারে আজ এসেছে দুঃসহ অপমান আর মৃত্যুর অন্ধকার নিয়ে। সুমিত এগিয়ে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো এই নির্মম দৃশ্য দেখে।

তার চোখে জল নামে।

বিজয় এর সারা বুক কি হাহাকারে দীর্ণ হয়ে ওঠে।

চোখের সামনে আজ নিজের এই চরম সর্বনাশকে প্রত্যক্ষ করে সে ভেঙ্গে পড়েছে দুঃসহ বেদনায়, দুঃখে-অপমানে। তার স্ত্রীকে ও সে রক্ষা করতে পারেনি কোন অন্ধকারের শয়তানদের হাত থেকে।

মালহোত্রা জীর এক নম্বর ডেরায় ওরা আজ রাত জেগে মাল পত্র আমদানী করছে। আরবদেশ থেকে বেশ কিছু মাল আসছে, মালহোত্রাজীর খবর আছে নেপাল বর্ডার থেকে বিকাশ আজ এসে পৌঁছবে।

এখনও আসেনি। ভাবনায় পড়ে সে।

কারণ পথে ঘাটে ঝামেলা হতে দেরী হয় না। এত টাকার সোনা সঙ্গে রয়েছে বিকাশের।

ভোর হয়ে আসছে। তখনও ফেরেনি তারা।

মালহোত্রজী ভাবনায় পড়েছে। হঠাৎ সকালের পর বিকাশকে ফিরতে দেখে চাইল।

ওর কপালে কিসের ক্ষত।

মালহোত্রা শুধোয়—এত দেরী কেন?

বিকাশ আসল ব্যাপারটা চেপে বলে।

পথে একটু ঝামেলা হয়ে গেল? ব্যাটারা গাড়ি চড়াও হতে চেয়েছিল, আমিও তাদের সিধে করে সোজা বের হয়ে এসেছি। তাইতো থোড়া চোট লাগলো।

মিঃ মালহোত্রা সাবধানী লোক। চোট এর থেকে ঝামেলাটাকে তারা বেশী ভয় করে। তাই শুধোয়।

—কোথায়?

বিকাশ বলে পাঙ্খাবাড়ি রোডে।

—মালুম পায়নি তো কিছু?

মালহোত্রার কথায় বিকাশ বলে—নাম্বার প্লেট দুসরা ছিল, আর চিনতেও পারে নি। আঁধারে বের হয়ে এসেছি।

মিঃ মালহোত্রা কি ভাবছে।

বলে সে—হুসিয়ার থাকবি। আজ আর বেরুবি না। গাড়ি গ্যারাজে ঢুকিয়ে রাখুক। মালপত্র ঠিক এসেছে?

বিকাশ সেদিকে খুবই নিপুণ ছেলে। পিতৃদেবের সামনে

পুরো মাল ভর্তি ব্রিফকেসটা তুলে ধরতে মালহোত্রাজী কিছুটা খুশী হয়।

চায়ের টেবিলে কাগজগুলো এসেছে। মালহোত্রাজী সকালে স্নান সেরে ব্রেকফাষ্ট টেবিলে এসে কাগজগুলোয় চোখ বুলিয়ে নেয়। শেয়ার মার্কেট, রাজনীতির খবর এসব তার জানা দরকার। পুলিশের নোতুন কাযেরও খবর রাখতে হয়।

তারপর বের হবে কারখানায়।

কাগজে বের হয়েছে প্রখ্যাত এ্যাডভোকেট বিজয় সেনের স্ত্রীর উপর অত্যাচার করে কারা খুন করে গেছে পাঙ্খা বাড়ির বন পাহাড়ের পথে,তার বোন ও গুরুতররূপে আহত অবস্থায় হাসপাতালে রয়েছে।

পাঙ্খাবাড়ি রোতের উপর ঘটনাটা ঘটেছে।

মিঃ মালহোত্রা খবরটা পড়ে মাত্র। তারপর তার দিনের কায সুরু হয়, আর নানান কাজে ডুবে যায়।

বিজয় এর দেহমনের উপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে দুদিনেই। লেখার মৃতদেহ আর রেবার জ্ঞানহীন দেহটাকে কলকাতায় এনে রেবাকে কোন নামী নার্সিং হোমে রেখে এদিকের ঝামেলা শেষ করতে দুটো দিন কোন দিকে কেটে যায়।

সুমিত ও সঙ্গে ছিল। তার এ কাজগুলোতে সুমিত ও হাত লাগায়।

তনুশ্রী ও এসেছে, মায়ের মৃতদেহ দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে। চীৎকার করে ওঠে—মাকে কারা এভাবে মারলো বাবা? কেন? কেন?

এর জবাব দিতে পারেনি বিজয় ও। তার সারা মনে ঝড় ওঠে। মনে হয় সে হেরে গেছে নিদারুণভাবে। তার স্ত্রীকে যারা চরম অপমান করেছে সেই অন্ধকারের জীবদের তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। শাস্তি দিতেই হবে তাদের।

ওখানকার পুলিশ ও হত্যার ডাইরী নিয়েছে, তারা তদন্ত করছে।

বিজয়ের কাছে সারা বাড়িটা শূন্য হয়ে গেছে। এ বাড়ির জীবন যাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপে জড়িয়ে আছে লেখার স্মৃতি।

সেই সুর ছন্দ থেমে গেছে। ঝি-চাকরেরাও জোরে কথা বলেনা, হরিপদকেই বুড়ো বয়সে এই সংসারের ভার নিতে হয়েছে। রেবাও বাড়িতে নেই। সে নার্সিং হোমে।

বিজয় চুপচাপ লাইব্রেরীতে বসে আছে। কোর্টেও যায় নি। এ যেন তারই এক দুঃসহ লজ্জা। এতদিন ধরে সে কায করে ক্রিমিন্যাল কেসের বিশারদ, বহু শত অন্ধকারের জীবকে বাঁচিয়েছে আইনের হাত থেকে। আজ সেই শয়তান জাতটার কেউই তার চরম সর্বনাশ করেছে। ওই শয়তানদের ব্রিফ নিয়ে আদালতে দাঁড়াতে তার যেন ঘৃণা বোধ হয় আজ।

গণেশ গোঁসাই বলে ডাইরী খুলে।

—কাল মালহোত্রাজীর সেলস্‌ট্যাক্স এর কেস, মীরচান্দানির গুদাম সিল করার কেস।

বিজয় বলে—জুনিয়ার মিঃ রায়কে এ্যাটেণ্ড করতে বলো।

কিন্তু স্যার আপনি?

বিজয় কড়াস্বরে বলে—যা বল্লাম তাই করুন গে। আমাকে শান্তিতে থাকতে দিন।

গণেশ গোঁসাই বের হয়ে গেল।

বৈকালে বিজয় সুমিতের সঙ্গে নার্সিং হোমে এসেছে রেবাকে দেখতে।

ক'দিন যমে মানুষে যেন টানাটানি চলেছে। জ্ঞান ফিরেছে রেবার দুতিনদিন পর।

বিজয় খুশী হয়—তাহলে এখন ভালো আছে রেবা?

ডাক্তার চাইলেন ওর দিকে। বলেন।

—নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে গেছে মিঃ সেন। দেহের আঘাত হয়তো কিছু দিনে সেরে যাবে, তারপর—

চুপ করে যান ডাক্তার। সুমিত শুধোয়—তারপর ?

ডাক্তার বলেন—লেট আস, সি। চলুন দেখে আসবেন।

রেবার চোখের সামনে বার বার সেই দৃশ্যটা ফিরে আসে, একটা দৈত্য তাড়া করেছে, দৌড়চ্ছে সে প্রাণভয়ে। পিছনে ওঠে সেই দৈত্যটার চাপা গর্জন। এগিয়ে আসছে সে :

চীৎকার করে ওঠে রেবা—বাঁচাও! বাঁচাও। না না—

উত্তেজনায় আতঙ্কে কাঁপছে ওর দেহ। নার্স ধরে ফেলে ওকে। ডাক্তারও এসে পড়ে।

বিজয় দেখছে তার প্রিয় বোনকে। আবার জ্ঞান হারিয়েছে রেবা। ডাক্তার একটা ইনজেকশন দিয়ে বলেন।

—এখনও সামলে উঠতে পারেননি শক্‌টা। ব্রেনেই চোট লেগেছে। ওকে পুরোপুরি রেষ্ট নিতে দিন। এখন দেখা না করাই উচিত। প্লিজ—

বিজয়, সুমিত বের হয়ে আসে।

বিজয়ের মনে ঝড় ওঠে।

বলে সে—সেই শয়তানরা একজনকে শেষ করে গেছে, রেবাকে ও এবার হারাতে নাহয় সুমিত।

সুমিত বলে—তবু এসব সইতে হবে বিজয়দা।

বিজয় শান্ত হবার চেষ্টা করে। শুধোয় সে

—দার্জিলিং থেকে তদন্তের কোন খবর এল সুমিত ?

কি যে করছে পুলিশ সেখানে ? ওই শয়তানদের ধরতেই হবে।

সুমিত বলে—দাদা, পুলিশ যা করার করবে। তার মধ্যে আপনিও চেষ্টা করলে কোন সুরাহা হতে পারে।

বিজয় চাইল ওর দিকে, কথাটা ঠিক যেন বুঝতে পারেনি সে।

—মানে ?

সুমিত বলে—অন্ধকারের জীবের নেতাদের আপনি অনেককেই চেনেন। তাদের জন্য অনেক কিছুই করেছেন। তাদেরই কাছে গিয়ে বলুন না। ওদের চর অনুচর সর্বত্র ছড়ানো ওরা নিশ্চয়ই কোন খবর বের করতে পারবে।

বিজয় ভাবছে কথাটা।

সুমিত বলে—এ দেশে যেখানে যত ক্রাইমই ঘটে সব খবর থাকে তাদের কাছে, এর খবর ও তারা চেষ্টা করলে বের করে দেবে।

বিজয়ের ও মনে ধরে কথাটা। মিঃ মালহোত্রা, মীরচান্দানি, মিঃ পেরেরার কথা মনে পড়ে। ওদের নানা ভাবে সাহায্য করেছে বিজয়। মিঃ মালহোত্রার ওদিকে চা বাগান আছে। জানা শোনাও আছে।

বিজয় ভাবছে কথাটা।

মিঃ মালহোত্রা গোপালবাবুর সঙ্গে বসে তার তিন নম্বর বসতি উচ্ছেদের প্ল্যানটা করছিল, এসব প্ল্যান গোপনে করতে হয়, কিছুদিন ধরে ওই বস্তির দুচার জন গুণ্ডাকে কিছু টাকা দিয়ে মদ দিয়ে হাতে এনে গোপালবাবু গোলমাল সুরু করিয়েছে, যাতে আতঙ্কে কিছু লোক অন্যত্র চলে যায়। তারপর যারা পড়ে থাকবে তাদের ও তুলে দেবে। দরকার হয় বসতিতে আগুনই জ্বলবে।

হঠাৎ এসময় বিজয়কে ঢুকতে দেখে চাইল মিঃ মালহোত্রা। কদিনেই বিজয়বাবুর চেহারাটাই বদলে গেছে। গোপালবাবু বলে।—আসুন বিজয় বাবু, শুনলাম সাংঘাতিক খবরটা। উঃ মনটা ভেঙ্গে গেলে একেবারে। দিন দিন সমাজের রূপটা কি হচ্ছে ? এতটুকু নিরাপত্তা নেই। যেন জানোয়ারের রাজ্য হয়ে উঠেছে।

মিঃ মালহোত্রা ও বলে—শুনে খুব দুঃখ পেলাম বিজয়বাবু। আপনার মত পরোপকারী লোকের উপর এমনি আঘাত করে

কেউ? সো সরি! আপনার এই বিপদে আমার সহানুভূতি জানাই বিজয় বাবু। পুলিশকে চাপ দিন, এদের ধরে আনুক। এসব শয়তানের বাচ্চাদের শাস্তি হওয়াই উচিত। ফাঁসী হওয়া উচিত। তা হঠাৎ এখানে?

বিজয় বলে—একটু দরকার ছিল মিঃ মালহোত্রা।

গোপালবাবু জানে নানা দরকারে মানুষ মালহোত্রার মত লোকের কাছে আসে।

সে গুলো গোপন থাকা দরকার। তাই গোপালবাবু বলে। —আপনারা কথা বলুন মিঃ মালহোত্রা। আমি ততক্ষণে আপনার একাউনটেন্ট এর কাছে দেখা করে আসছি। এ মাসের অগ্রিমের চেকটা নাকি হয়ে আছে।

চলি বিজয়বাবু।

গোপালবাবু বের হয়ে গেল। মালহোত্রা এবার চাইলো বিজয়ের দিকে। বিজয় কি ভাবছে।

মালহোত্রা বলে—বলুন কি করতে পারি আপনার জন্যে।

বিজয় কারো কাছে কোন সাহায্য নেয় নি। নিতে তার নিজেরই বাধে, কিন্তু আজ সে বিপন্ন, কিছুটা অসহায়। তার স্ত্রীর অত্যাচারীদের আজ ও কোন পাত্তাই পায়নি।

বিজয় বলে—আপনার সাহায্যের জন্য এসেছিলাম মিঃ মালহোত্রা।

মালহোত্রা বলে—আমার সাহায্য করা সম্ভব হলে নিশ্চয়ই তা করবো বিজয় সাব্। বলুন কি করতে হবে?

বিজয় বলে—এদিকের অন্ধকারের বহু জীবদের আপনি চেনেন, অনেকে আপনার সাহায্যেই বেঁচে আছে। ওই দিকের চা বাগান, বর্ডার এলাকাতে আপনার খুব প্রতিষ্ঠা আছে তা জানি। আমার স্ত্রীকে কারা ওই দিকের বনে চরম অপমান করে খুন করলো, বোনকে পাগলই হতে হবে বোধ হয় তাদের জন্য।

আমি সেই দোষীদের খুঁজে পেতে চাই। তাদের শাস্তি দিতে চাই, তাই এসেছি আপনার কাছে।

মিঃ মালহোত্রা কি ভাবছে। বলে সে।

—কিন্তু এসব যারা করেছে তাদের খুঁজে পাবো কি করে?

বিজয় বলে—অন্ধকারের জগতে যেখানে যে অপরাধিই হোক আপনারা ইচ্ছা করলেই তা জানতে পারবেন। পাঞ্চাবাড়ি রোডের উপর আমার স্ত্রীর গাড়িতে আক্রমণ হয়েছিল গত শনিবার রাত্রে, আন্দাজ সাতটা আটটার মধ্যে—

মিঃ মালহোত্রা চমকে ওঠে। ওই সময় তার ছেলে বিকাশই ওই পথ দিয়ে এসেছে, তার কপালে চোট ও দেখেছিল। ঝামেলার কথা বলেছিল, কিন্তু বিকাশই এসব করেনিতো? কেমন যেন অঙ্কটা মিলে যাচ্ছে মালহোত্রার। কিন্তু চমকে ওঠে মালহোত্রা, বিকাশ সাংঘাতিক অন্যায় একটা কাজ করেছে, বিজয় সেনকে চেনেনি।

ওর হাতে পড়লে বিজয় সেন ওকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দেবে, বিকাশকে কলকাতা কেন ভারতবর্ষে কোন এ্যাডভোকেট নেই বাঁচাতে পারে।

মালহোত্রার এটা জানা দরকার।

এদিকে সে বিজয়বাবুকে ও চটাতে চায়না। কারণ অন্ধকারের ব্যবসা তাদের চালাতেই হবে। তাই ওকে ও দরকার।

মালহোত্রা তবু নেতিবাচক ভাবেই বলে।

—আমি চেষ্টা করছি বিজয়বাবু, আপনার জন্য কিছু করতে পারলে খুশী হবো। তবে কি জানেন—এসব নোংরা কায যারা করে তারা বাইরের ছুটকো বদমাইস। এদের পাত্তা বের করা কঠিন। তবু চেষ্টা করবো।

বিজয় দেখছে ওকে। আইনজ্ঞ সে। মানুষ চেনে। মালহোত্রার কথার সুরে আগেকার সেই উষ্ণতা নেই এটা বুঝেছে। বিজয় অনুমান করে কি হবে ওর চেষ্টার ফল। তাই বিজয় বলে—দেখুন

যদি সাহায্য করতে পারেন। তবে মিঃ মালহোত্রা এও বলে যাচ্ছি, অন্ধকারের সেই জানোয়ারকে একদিন না একদিন খুঁজে বের করবোই, আর সেদিন তাদের ছাড়বোনা। পরে খবর নেব, চলি।

বের হয়ে গেল বিজয়। মালহোত্রা 'ইণ্টাররুমে তার ছেলেকে ডেকে পাঠায়।

বিকাশ ঘরে ঢুকতে মিঃ মালহোত্রা এগিয়ে আসে। সে চেনে তার ছেলেকে। মালহোত্রা শুধোয়।

সেদিন রাতে পাঞ্চাবাড়ি রোডে কি করেছিলি? একটা গাড়িতে দুজন মেয়েছেলে যাচ্ছিল তাদের উপর অত্যাচার করতে গেছলি? খুন করেছিস একজনকে?

বিকাশ চমকে ওঠে।

সে স্বপ্নেও ভাবেনি যে একথা কোনদিন প্রকাশ পাবে। তার সহকারী চন্দর ও কোনদিনই বলবে না। কিন্তু এখন খোদ পিতাজীর কাছে কি করে পৌঁছলো জানেনা সে।

মালহোত্রা গর্জে ওঠে—জবাব দে? সাচ্?

চুপ করে থাকে বিকাশ। ব্যাপারটা বুঝে নিয়েই মালহোত্রাজী এবার ছেলের গালে সপাটে একটা চড় মেরে গর্জায়।

—উকৌন থী মালুম? এডভোকেট্ বিজয় সাব্‌কা জরু আউর বহিন।

বিকাশ ও এবার চমকে ওঠে। মালহোত্রা বলে।

—খুন করলি? বিজয় সাব্ পাগলা কুত্তার মত খুঁজছে, একবার মালুম পেলে তোকে ছাড়বে? সিধা ফাঁসীকা তক্তে পর উঠা দেগা! হারামজাদ কাঁহিকা! সর্বনাশ কর দিয়া।

বিকাশ ও বিপদের গুরুত্ব বুঝেছে এবার।

মালহোত্রা বলে—আজ ইভনিং ফ্লাইটে সিধা বোম্বে চলে যা, তোর পাশপোর্ট রেডি আছে, বোম্বে অফিস ভিসা করিয়ে দেবে,

কালই আবু কাবি ভেগে যা। এখন এখান থেকে হুঁসিয়ার হয়ে কাজকাম দেখবি। এদিকে আসবি না! যা—

ছেলেকে পত্রপাঠ এ দেশ থেকে বিদায় করার ব্যবস্থা করে এবার ভাবছে মালহোত্রা। বিজয়ের বৌ তো মারা গেছে, বাকী আছে ওর বোন। সে ও এখন ও অসুস্থ! মাথা ঠিক তেমন নেই।

তবু সাবধান হওয়া দরকার। ওই খুন, রেপের কেসের তদন্তটাকে ভেস্তে দিতে হবে কৌশলে।

গোপালবাবু ফিরে এসে দেখে মালহোত্রা কি ভাবছে। ওকে দেখে মালহোত্রা বলে—দার্জিলিং এর এস-পি তোমার চেনা?

গোপালবাবু আভাষে বুঝে নেয়, একটা কিছু দরকার আছে। বলে সে—হোম ডিপার্টমেন্টে লোকজন আছে। মনে হয় অসুবিধা হবেনা।

মালহোত্রা বলে—পাঙ্খাবাড়ি থানার ও-সি কে বদলি করতে হবে। আর সেখানে যাবে এমন কেউ যে আমাদের কথা ঠিক মত শুনবে।

গোপালবাবুর কাছে এসব অতি সাধারণ কথা। বলে সে। ও হয়ে যাবে ওর জন্য ভাববেন না—মালহোত্রাজী। আপনার বস্তির ব্যাপারে ও এবার ব্যবস্থা করেছি।

...বিজয় মিঃ মীরচান্দানি, পেরেবার কাছেও গেছে। কিন্তু দেখছে ওরা ও তেমন কোন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয় নি। শুধু মৌখিক সহানুভূতিই জানিয়েছে মাত্র।

বিজয় সেন এতদিন ধরে মূর্খের স্বর্গেই বাস করছিল। এবার তার ভুল ভাঙ্গছে। ক্রমশঃ চিনেছে ওই লোকগুলোকে। এতদিন ধরে বিজয় ওদেরই বাঁচিয়েছে। আজ মনে পড়ে সুমিত, লেখার কথাগুলো। বার বার লেখাও বলেছিল—ওই সাপের মত হিংস্র, শয়তানদের বার বার বাঁচিয়ে সমাজে ক্রাইমের সংখ্যাই বাড়াচ্ছো! একদিন তারা তোমার উপরই হাত তুলবে।

আজ হেস কথাটাই সত্যে পরিণত হয়েছে।

তনুশ্রী চুপ করে গেছে। তার গান—নাচ, কলরব আর নেই সারা বাড়িটা একজনের অনুপস্থিতে যেন শ্মশানের স্তব্ধতায় ডুবে গেছে।

খাঁচার পাখীটা আগের মতই ডেকে চলেছে—মা খিদে পেয়েছে। মা—

আজ লেখা নেই।

তনুশ্রীই স্কুল থেকে ফিরে হরিপদকে নিয়ে ওকে খাবার দিচ্ছে।

—বাবা!

বিজয় তনুশ্রীর ডাকে চাইল। তনুশ্রী এগিয়ে আসে। বলে সে।

—একা একা কি করছো বাবা? কোর্টেও যাওনা?

বিজয় ক'দিন এখনও নিজেকে যেন ফিরে পায়নি। ওই ক্রিমিন্যালদের উপর তার যেন ঘৃণা এসে গেছে। কোর্টে ও যেতে মন চায় না। তবু মেয়ের কথায় বলে সে।

—যাবো এইবার!

তনুশ্রী বলে—পিসীমণি সেরে উঠবে কবে বাবা?

রেবা দৈহিক দিক থেকে সুস্থ। তাই ওকে এনেছে বাড়িতে। দুজন নার্স পালা করে তাকে দেখছে। ডাক্তার সোম আসেন। সুমিত আসে কাযের অবসরে। রেবার উপর একটা কর্তব্যই রয়ে গেছে তার। রেবার মনের অতলে সেই ঝড়টা যেন চিরন্তন আসন পেতেছে। তার সব চিন্তা গুলোকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে ওই একটা কালো দুর্যোগের আতঙ্ক

এখনও সে যেন কাউকে সইতে পারছেনা। তার মনের নীরব হাহাকার গুমরে ওঠে। একটা দৈত্য তাদের সব স্বপ্নকে ব্যর্থ করে দিল। বৌদি ও নেই। ভাবতে ও দুচোখে জলে ভরে আসে।

হঠাৎ চমকে ওঠে রেবা। পায়ের শব্দ ওঠে—চোখের সামনে

ভেসে ওঠে দুর্যোগের আঁধার রাত্রি, দৈত্যটা ধরে ফেলবে তাকে। চীৎকার করছে রেবা।

পালাবার চেষ্টা করে—না, না। বাঁচাও—বাঁচাও।

নার্স ধরে ফেলেছে তাকে।

হাপাচ্ছে রেবা। সুমিত এসেছিল ওর ঘরে। সুমিত বলে। —রেবা! আমি! রেবা?

—তুমি? রেবা শূন্য উদাস উদভ্রান্ত চাওনি মেলে দেখছে সুমিতকে। যেন চেনে না।

বিজয় ও এসেছে। তনুশ্রী এগিয়ে যায়—পিসীমণি?

—তুই! তনু!

রেবা ওকে জড়িয়ে ধরে এবার দুঃসহ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

সুমিত দেখছে রেবাকে। ডাক্তার সোম বলেন।

—এখনও স্বাভাবিক অবস্থা আসতে দেরী হবে সুমিত বাবু। আপনি তবু আসবেন। ও বেচারার এখন সহানুভূতির খুবই দরকার। নাহলে ও জীবনে আর বিশ্বাস, ভালোবাসাকে কোনদিনই ফিরে পাবে না।

বিজয় বলে—ওই শয়তানরা ওর সব কেড়ে নিয়েছে সুমিত। আমার ও। চল, চা খেয়ে যাবে।

বৈকালে চায়ের আসর আগেকার মত আর জমে না।

মীনা বৌদি এ বাড়িতে আসে মাঝে মাঝে রেবাকে দেখতে। সেই-ই আজ চা পরিবেশন করছে। বিজয় বলে।

—ওখানের পুলিশ রিপোর্ট, কিছু এল সুমিত?

সুমিত রেবার ব্যাপার নিয়ে কথাটা জানাতে ভুলে গেছল। এবার খেয়াল হয় তার।

সুমিত বলে—ওখানের রিপোর্ট নিয়ে একটা ব্যাপার ঘটে গেছে বিজয়দা। আমরা অবশ্য আর্জেন্ট ম্যাসেজ পাঠিয়েছি।

—আবার কি হল? বিজয় শুধোয়।

সুমিত জানায়—ওখানের থানার ও-সিকে বদলি করা হয়েছে। নোতুন ও-সি কেসটা টেক আপ করেছে।

চমকে ওঠে বিজয়। জানে সে এই বদলির ফল কি। বিজয় বলে। —সেকি। ওই অফিসার তবু কিছু জানতো, ওকেই বদলি করা হোল, এখন নোতুন যিনি গেছেন তিনি কি তদন্ত করবেন?

বিজয় গম্ভীর হয়ে যায়। ভাবছে কথাটা। এই সময়েই বিশেষ করে ওই ও-সিকে বদলি করার কি কারণ ঘটলো বুঝতে পারেনা, তার মনে হয় বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই এটা করানো হয়েছে। খুনের মামলার প্রাথমিক তদন্তে দেরী হলে প্রমাণ লোপের আর বিকৃত রিপোর্টের সম্ভাবনাই বেশী থাকে। এক্ষেত্রে সেইটাই ঘটবে বলে তার মনে হয়।

তাই বিস্মিত হয়েছে বিজয়।

বেশ বুঝেছে একটা অদৃশ্য হাত তার এই কেসের মধ্যেও নেমে এসে একটা ওলট পালট করতে চাইছে।

আইনজ্ঞ হয়ে সে জানে আইনের সামনে প্রমাণ না থাকলে, ঠিকমত তদন্তের রিপোর্ট না থাকলে—আসামীদের আদৌ ধরা না গেলে বিচার কোন দিনই হবে না।

আজ অবধি কাউকেই ধরা হয় নি, রিপোর্ট যা এসেছে তা আংশিক; অথচ তার কেসের আসামীদের সন্ধ্যানে সে 'ক্রাইম কিং' মালহোত্রা, মীরচান্দানী, পেরেরাদের কাছে বার বার গেছে অনুরোধ করতে। তাতে সুরাহা কিছুই হয় নি। হয়েছে উল্‌টো বিপত্তি।

আজ মনে মনে বিজয় অসহায়, নিস্ফল রাগে ক্ষেপে উঠেছে। ফোনটা বাজছে, সুমিতই ধরেছে। ওর ফোন। কোথায় গোলমাল সুরু হয়েছে এখুনিই যেতে হবে।

সুমিত বলে—আজ যাচ্ছি বিজয় দা। পরে আসবো।

গোপাল বাবুর কাযটা নিখুঁত ভাবেই সুরু হয়েছিল।

তিন নম্বর বস্তিটা প্রায় বিঘে আষ্টেক জায়গা জুড়ে, বড় রাস্তার উপরই।

আগে এদিকে ছিল জলা, হোগলাবন। লোকজনের বসতি বিশেষ ছিল না। সেইকাল থেকে কিছু মানুষ এই জলা জমির কিছুটা বুজিয়ে বসত সুরু করে। তারপর বসতি বেড়েছে, জায়গাও বেড়েছে।

এদিকে শহর এখন বাড়তে বাড়তে এখানে ও এসেছে। এখন এটা অভিজাত এলাকাই। প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা কাঠা। চারিদিকে বড় বড় রাস্তা, সুন্দর বসতির মাঝে এই নোংরা বসতিটাকে তোলার জন্য অনেক বেশী করে আজ শেষ আঘাত এনেছে মালহোত্রার অর্থপুষ্ট গুণ্ডাবাহিনী। রবার্টসন্ ও এসেছে দলবল নিয়ে।

বসতির মানুষ ও এতদিন ধরে এখানে বাস করেছে, খাজনা দিয়েছে মালহোত্রাকে। আজ এভাবে উঠে যেতে রাজী নয় তারাও মরীয়া হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে।

রবার্টসনের নেতৃত্বে গুণ্ডা বাহিনী বোমবাজী শুরু করেছে, বন্দুকের, পাইপগানের গুলিতে দুতিনজন পড়ে গেছে, তবু এরা ও বাধা দেয়। বস্তির মেয়েরাও আগুন নেভাবার চেষ্টা করে। চীৎকার কলরব ওঠে। রবার্টসন্ চীৎকার করে—

খতম করে দেও।- তোড় দো বস্তি।

এমন সময় পুলিশ এসে পড়ে। সুমিত দূর থেকে দেখেছে রবার্টসনকে। পুলিশের নাম শুনে গুণ্ডাবাহিনী পালাবার চেষ্টা করে। পুলিশকে গুলি চালিয়ে নিরস্ত করে পালাতে চায় ওরা।

কিন্তু সুমিত ঘিরে ফেলেছে তাদের। আর রবার্টসনকে ও আজ ধরেছে।

এলাকার সাধারণ মানুষ ও ক্ষেপে গেছে এই নিষ্ঠুর অত্যাচারে। পুলিশ ওদের ধরে চালান করেছে।

রবার্টসন্ বলে—আমি এসবের কিছু জানি না ইন্‌সপেক্টর আমাকে ঝুটমুট হয়রানি করছেন। ছেড়ে দিতেই হবে।

সুমিত বলে—সে পরে দেখা যাবে। এখন তো চল সাহেব।

মীরচান্দানি পেরেরা গোপালবাবু সকলেই এসেছে মালহোত্রার কাছে। গোপালবাবু তখন বীর দর্পে বলে চলেছে—তিননম্বর বস্তি এর মধ্যে ক্লিয়ার মাঠ। এবার পরিস্কার করে কায শুরু করুন মিঃ মালহোত্রা।

মালহোত্রা ও খুশী হয়েছে বিরাট একটা সম্পদই উদ্ধার করেছে আজ সে গোপালবাবুকে দিয়ে। সেই খুনের কেসের রিপোর্ট ও দেরী করিয়েছে পরে যা রিপোর্ট আসবে তাতে আসামীর সাজাও হবে না।

মালহোত্রা বলে—দেখছি।

মীরচান্দানি ইদানীং ইলেকসানে দাঁড়াতে চায়। তাই গোপাল-বাবুকে তোয়াজ করে—এবার আমরা ভি চীফ লীডার বানিয়ে দেব।

হাসছে গোপালবাবু। হঠাৎ খবরটা আসে। ওই বস্তির গোলমালের মধ্যে পুলিশ অফিসার সুমিত রায় এসে রবার্টসন্‌কে দলবল সমেত এ্যারেষ্ট করেছে। একজন মারা গেছে বোমার ঘায়ে, বস্তির লোকজন আহত হয়েছে অনেকে আর বস্তির দখল তো হলই না। উলটে বস্তির উপর হামলার দায়ে জমির মালিক মিঃ মাল-হোত্রাকে ও জড়ানো হবে, আর রবার্টসন্‌কে এবার ছাড়বে না। খুনের দায়ে এ্যারেষ্ট করা হয়েছে তাকে।

ওদের কালনেমির লঙ্কা ভাগ পর্ব এই খানেই শেষ হয়ে যায়। মালহোত্রা গর্জে ওঠে—ছাট সুমিত রায় খুব বেড়েছে। গোপালবাবু ওকে বদলি করা ও গেল না?

গোপালবাবু বর্তমান পুলিশ কমিশনারকে কায়দা করতে পারেনি। তবে এবার ভোটে ওর দল জিতলে ওকে তাড়াবেই।

এখন তারা বিপদেই পড়েছে। মীরচান্দানি কি ভাবছে। মালহোত্রা বলে—আবার বিপদে ফেললো রবার্টসন্, এদিকে এতবড় প্রপার্টির দখল ও আটকে গেল। রবার্টসন্‌কে তাড়াতে হবে?

মীরচান্দানি বলে—ওই সুমিত রায় আবার ওর দাদার মতই কায শুরু করেছে।

পেরেরা বলে—এইবার মৌকা পেলে ওকে ও দাদার কাছেই পাঠিয়ে দেব মীরচান্দানি।

মালহোত্রা বলে ওঠে—এখন ওসব থাক। রবার্টসন্‌কে খুনের দায় থেকে বার করে আনতে হবে। আমি ও এসব ঝুটমুট নফরা থেকে তফাৎ থাকতে চাই। ওই বস্তির লোকরাই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছিল বোম চালিয়ে ছিল এই কথাই আদালতে জানাতে হবে।

গোপালবাবু বলে—ওর জন্য ভাবনা কি? বিজয়বাবু তো আছে। আপনাদের কেস তো ওই ই করে। ওসব ব্যবস্থা করে দেবে।

বিজয় লাইব্রেরীতে গল্প করছিল তনুশ্রীর সঙ্গে। রেবা এখন এসে বসে, তবে কি যেন ভাবে, শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে দূরের দিকে।

গণেশ গোঁসাই ফোনটা ধরে লাইনটা ভিতরে দিতে বিজয় ধরেছে—মিঃ মালহোত্রা বলছি।

বিজয় এর মনে হয় মালহোত্রা তাকে ওই কেসের সমন্ধে কোন খবরই দেবে। সে এবার স্ত্রীর উপর অত্যাচারের শোধ নিতে পারবে। বলে বিজয়—বলুন! ওদিকের কোন খবর পেলেন?

মালহোত্রা পাকা অভিনেতা। সে তার মনের দুর্বলতা চেপে রেখে বলে—এখনও পাত্তা পাই নি। পেলেই জানাবো বিজয়!

ওই উত্তরই শুনেছে কয়েকবারই। তাই চুপকরে যায়। বেশ বুঝেছে ওরা মিথ্যে কথাই বলেছে তাকে।

মালহোত্রা বলে—একটা গড়বড় হয়ে গেছে, তিন নম্বর বস্তিতে

পুলিশ ঝুটমুট আমাকে ও জড়াচ্ছে, আর রবার্টসন্‌কে ও ধরেছে। মিথ্যা মার্ডার চার্জ দেবে শুনলাম। কেসটা কাল আপনাকে এ্যাটণ্ড করতে হবে।

বিজয় ওদের নোংরামির পরিচয় পেয়েছে। আর ওদের মত লোকের কেস সে করবে না। রবার্টসন্‌দের জেলে পোরাই উচিত। তাহলে মালহোত্রাদের খুনের হাত থেকে কিছু গরীব মানুষ বাঁচবে।

মালহোত্রা বলে—তাহলে কাল সকালে যাচ্ছি। আমার ও নামটা সই করে আসবো ওকালতনামায়।

ফোনটা বেজে যায়, বিজয় যেন রাজী হয়েছে এই ভাবে ওরা। বিজয়ের কিন্তু কথাটা ভাবতে ও আজ ঘৃণা করে। ওরা টাকার জোরে বিজয়কে কিনে রেখেছে এই ভাবই দেখায়। আজ আর ওপথে যাবে না সে।

গণেশ গোঁসাই খুশী হয়েছে। কতদিন পর বিজয়বাবু আবার লাইব্রেরীতে বসে মামলার কাগজপত্র দেখছে। গণেশ বলে—কায কর্মের মধ্যে থাকলে মনটা ভালো থাকবে স্যার।

—তাইনাকি! বিজয় চাইল।

সুমিতকে ডাকিয়ে এসেছে বিজয়। সে তার ইতিকর্তব্য ঠিক করে ফেলেছে, আজ আইনের পূর্ণ সদ্ব্যবহারই করবে সে। এতদিন ধরে তার আইনের জ্ঞানকে টাকার জন্য শয়তানদের কাছে বিক্রী করেছিল। এবার আর তা করবে না। সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করবে। দোষীর সাজাই যাতে হয় তাই দেখবে বিজয়।

সুমিত ওর কথা শুনে অবাক হয়। বলে সে—একি বলছেন বিজয় দা?

বিজয় বলে—এতদিন ভুলই করেছি সুমিত; তোমার দাদা, লেখা ও বলতো ওই কথা। তুমি ও বলেছো। সমাজের ক্রাইমই বাড়িয়েছি আমরা আইনের নাম করে। তাই আজ অনেক দাম দিয়েছি সুমিত। লেখার চরম অপমানের শেষে আমি নিতে

পারিনি। তাই প্রায়শ্চিত্তই করবো এবার। তুমি আসামীদের ধরে আনো, এবার আর তাদের কেউ বের করে নিয়ে যেতে পারবে না। ওদের জেলেই পাঠাবো। তোমার কালকের বস্তির কেস আমি নেবো।

সুমিত এবার খুশী হয়েছে। বলে সে—সত্যিই।

বিজয় বলে—কেসটার হিষ্ট্রি দিয়ে দাও আমি পাবলিক প্রসিকিউটার মিঃ দত্তকে জানিয়েছি।

বিজয় কেসটা দেখছে এমন সময় গণেশ গোঁসাইকে ঢুকতে দেখে চাইল। গণেশ জানায় মিঃ মালহোত্রা, মীরচান্দানি, মিঃ পেরেরা এসেছেন।

বিজয় কি ভেবে বলে—ওদের সব কেসের নোটগুলো নিয়ে আসুন। ওদের ছোট বড় পাঁচ ছটা কেসই আছে। মীরচান্দানির গুদামে বেআইনী মাল সিজকরার কেস, পেরেরায় কোন ডিলারকে আহত করার ফৌজদারী মামলা, চালান জাল করার কেস ও রয়েছে। মালহোত্রার আজকের কেস ছাড়াও আর ও দুটো কেস করছে বিজয়।

ওদের ঢুকতে দেখে চাইল। মালহোত্রা এসেছে দলবল নিয়ে, ওরাও এসেছে তাদের বিভিন্ন কেসের তদ্বির করতে। মালহোত্রাকে দেখে বিজয় চাইল। মালহোত্রা বলে

ওকালতনামাটা নিয়ে আসুন গণেশবাবু, সই করে দিয়ে যাই। যেন বিজয়ের বলার কিছুই নেই।

গণেশ বাবু ফর্ম আনতে বিজয় গম্ভীর স্বরে বলে—ওটা নিয়ে যান গণেশবাবু।

গনেশ গোঁসাই অবাক হয় বলে—সে স্যার—ওর কেস।

বিজয় বলে—আপনি নিয়ে যান। মিঃ মালহোত্রা আমি দুঃখিত আপনার এ কেস আমি নিতে পারছি না।

মালহোত্রা অবাক হয়—সেকি। তাহলে কেন সত্যিই গড়বড়।

বিজয় মরা মামলা নেয় না। তাই মালহোত্রাও ঘাবড়ে গেছে। বিজয় বলে—ও সব আমি জানি না। তবে আপনার কেস আমি নিতে পারছি না।

মীরচান্দানি বলে—আমার গুদাম সিজ করার কেসটার ডেট পড়েছে—

পেরেরাও শোনায়—আমার ফৌজদারী কেসের ভি ডেট আছে। আর একটা কেস ভি আছে।

বিজয় দেখছে ওদের। ওদের ভিতরের পরিচয় সে জানে। আজ ওদের হয়ে কেস করে ওই মানুষগুলোকে বাঁচাবে না সে। বিজয় বলে—এই আপনাদের সব কেসের নথীপত্র, এবার এসব দয়া করে নিয়ে যান। আমি আপনাদের কোন কেস আর করবো না।

মালহোত্রা অবাক হয়—সেকি ?

মীরচান্দানিও অবাক হয়—কি বলছেন মিঃ সেন আমরা বিপদে পড়বো !

বিজয় বলে—উকিলের তো অভাব নেই ? পয়সা আছে আমাদের। কোন বিপদই হবে না। আমাকে মাপ করবেন।

বিজয় ওদের এড়াবার জন্যই উঠে পড়ে। মিঃ মালহোত্রা গম্ভীর হয়ে গেছে ওরা উঠে বের হয়ে যায়। গাড়িতে উঠে মিঃ পেরেরা বলে।

ডাঁট। এমন উকিল ঢের দেখেছি। মিঃ মালাহোত্রা চলুন মিঃ গোয়েলের কাছে। আমার চেনা জানা। আইনের বাঘ, ওকে দিয়েই কেস করাবো এবার থেকে।

মিঃ মালহোত্রা চুপ করে থাকে। চতুর লোকটা বিজয়ের এই অসহযোগিতাকে ভালো চোখে দেখেনি। ওর মনে হয় বিজয় নিশ্চয়ই কিছু টের পেয়েছে।

মীরচান্দানি ও একটু ভয় পেয়েছে বিজয়ের এই ব্যবহারে। বলে সে—বিজয়সাব্ এই সা বিগড়ে গেল কাহে ?

পেরেরা বলে—লেট হিম গো টু হেল।

মিঃ গোয়েলকেই কেস দিয়েছে মালহোত্রা। রবার্টসন্‌কে ও ছাড়াতে হবে আর মিঃ গোয়েলের সওয়াল জবাব শোনার জন্যই এসেছে ওরা আদালতে। মালহোত্রাকে আসতে হয়েছে আসামী হয়েই ওকে কোর্টে পেশ করতে হবে তার জবাব।

মিঃ মালহোত্রা একটু আশ্বস্ত হয় সরকারী তরফে জুনিয়ার একজন উকিলকে দেখে মনে হয় মিঃ গোয়েল কেস জিতে যাবে।

ইনস্‌পেক্টার সুমিত ও রয়েছে। মিঃ গোয়েল রবার্টসন্‌কে নিরাপরাধ বানিয়ে তাকে মুক্ত করার আবেদন জানিয়ে বসতে দেখা যায় এবার এজলাসে দাঁড়িয়েছে স্বয়ং বিজয় সেন।

চমকে ওঠে মালহোত্রা, বিজয় তাদের হয়ে তো দাঁড়ায়নি। উলটে তাদের বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়েছে।

বিজয় সেন বলে—ইওর অনার, মিঃ রবার্টসন্‌ যেখানেই গোলমাল সেখানেই হাজির থাকেন। কোনদিন চার্চে যান, কখনও রাতদুপুর হাওয়া খেতে যান আর পুলিশ তাকে গোলমালের স্পট থেকে বার বার তুলে আনে। এই বার ও ঠিক তুলে এনেছে মিঃ রবার্টসন্‌কে।

বিজয় ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে ওর চোখে চোখ রাখতে রবার্টস্‌ এর বুক কেঁপে ওঠে। বিজয় প্রশ্ন করে—এবার ওখানে কি করতে গেছিলেন?

মিঃ গোয়েল আগেকার কেসের রেফারেন্স টেনে কথা বলতে দেখে আপত্তি তোলে—এটা আপত্তিকর।

সমান চোটে ধমকে ওঠে বিজয়—সাক্ষীকে জেরা করার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে ইওর অনার?

জজসাহেব মিঃ গোয়েলের আপত্তি নাকচ করে দিতে বিজয় প্রশ্ন করে রবার্টসন্‌কে—জবাব দিন।

রবার্টসন্‌ নীরব। সারা আদালত স্তব্ধ। এবার বিজয় বলে।

এর জবাব এই ছবিটাতেই আছে ইওর অনার। একজন প্রেস ফটো-গ্রাফার এটি তুলেছেন, যথাসময়ে কাগজেও প্রকাশিত হবে। তারই ব্লো আপ। একহাতে রিভলবার, অন্য হাতে বোমা নিয়ে ছুটছেন যে ব্যক্তি, তিনিই আমাদের মিঃ রবার্টসন্ এই যে—

মিঃ গোয়েল আপত্তি তোলে অবজেক্শন।

বিজয় বলে—আমারতথ্য এ নয় ইওর অনার, এটা ছবি এ্যাকসন পিকচার।

জজসাহেব ও নিশ্চিন্ত হন। রবার্টসন্‌কে এতদিন পর আজ হাতে নাতে পেয়েছে পুলিশ। মিঃ গোয়েলের কোন যুক্তিই খাটে না

রবার্টসনের জেলহাজত বাসের হুকুম হল, আর যা প্রমান, সাথে এনেছে তাতে ও ছাড়া পাবে না, খুনের দায়ে দীর্ঘ মেয়াদী জেলই হয়ে যাবে। সত্য বলে প্রমানিত হবে। তাই তাকে জামিনে খালাস না করে ওই বস্তি এলাকায় ইন্‌জাকশান জারি করা হল। মিঃ মালহোত্রা ওদিকে যাবেন না।

প্রথম কেসেই আজ মালহোত্রা, মিরচান্দানীর ঘাবড়ে গেছে। বিজয় এতদিন তাদের নানা ভাবে বাঁচিয়েছে আজ আর সে পথ নেই ওই কেসেই মালহোত্রা প্রমাদ গনছে।

তাই বিপদে পড়েছে তারা। গোপালবাবু ও সন্ধ্যায় আসবে এসে পড়েছে। সব শুনে সে বলে এতো দেখছি বিপদ হয়ে গেল। বিজয় বাবু ও হঠাৎ দেশ সেবার কাযে ধর্ম ন্যায় প্রতিষ্ঠার কাযে লেগে গেল। বুঝলেন, বৌ মারা যাবার পর ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

মীরচান্দানা বলে—এ এখন আমাদের পিছনেই লেগেছে। এদিকে মালপত্র কিছু আসবে আজ, গুদাম জাত করতে পারলে বাঁচে।

পেরেরাকেই এখন এসব কায করতে হবে। রবার্টস্ এর মত একজন কাযের লোককে ওরা আটকেছে।

সুমিত আজ এতদিনকার কেস জিতেছে, বাইরে এসে বিজয়কে প্রণাম করে। বিজয় বলে—কি ব্যাপার ?

সুমিত বলে—আজ জয়ের মুখ দেখেছি দাদা

হাসে বিজয়। সে ও দেখছে আদালতে মালহোত্রাদের। মনে পড়ে লেখার কথা। মনে হয়েছে আজ বোধহয় লেখার আত্মা কিছুটা তৃপ্ত হবে।

বিজয় বলে—কেস ধরো, এইবার কাউকে বেরুতে দেব না।

সুমিত ও নোতুন উৎসাহে এবার কাযে নেমেছে। খবর আসে মীরচান্দানির গুদামে বেশ কিছু বেআইনী মাল আসছে আজ রাতে

সুমিতের প্রথম থেকেই রাগটা রয়েছে ওদের উপর।

তার দাদাকে হত্যা করেছিল ওরা মীরচান্দানির গুদামেই, আজ যেন সেই প্রতিশোধ নেবার সুযোগ এসেছে তার

মীরচান্দানিও হুঁসিয়ার হয়ে গেছে। তার চরও ঘুরছে আশ-পাশে। তারাই খবর আনে সুমিতের গতিবিধির।

সুমিত আজ ওদের হাতে নাতে ধরতে চায়, তাই ট্রাকখানাকে অন্ধকারে ধাওয়া করে আসছে, ট্রাক বোঝাই মাল গুদামে ঢুকলে তারপর ওরা গিয়ে হানা দেবে।

লতিফ সাহেব আজও রয়েছে সঙ্গে। ক'বছর আগে এমনি এক রাতের কথা মনে পড়ে তার। সেদিন অমিতই রেড করতে গেছল ওই গুদামে, কিন্তু আর ফিরে আসেনি। লতিফ সাহেব বলে সুমিতকে।

—হুঁসিয়ার থাকবেন সুমিতবাবু, ওরা সাংঘাতিক লোক।

সুমিতও তা জানে। তবু আজ সে ছাড়বেনা তাদের।

ট্রাকটা অন্ধকারে এদিক ওদিক ঘুরে শেষ অবধি গিয়ে গুদামের মধ্যে ঢুকেছে। পেরেরাও হাজির ছিল, মীরচান্দানি বলে—জলদি কায শেষ কর।

ঠিক সেই সময়েই সুমিতের জিপটা ঢুকেছে। পেরেরা ও জানতো

সুমিতরা আসবে। আজ পেরেরা তাদের জালে পেয়েছে। আর একই ভাবে উপরে জীর্ণ আধা মেরামত করা সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে ভারি ভারি মালপত্র ফেলছে, সিঁড়ির উপর ড্রামগুলোকে ফেলে, জীর্ণ সিঁড়িটা ওই ভাবে সশব্দে ভেঙ্গে পড়ে আজও।

কিন্তু সুমিত ওই পথেই যায় নি। সিঁড়ি থেকে দূরে তাদের পালাবার অন্য সিঁড়িটা আটকে রিভলবার হাতে দাঁড়িয়ে আছে। পেরেরা বিপদ বুঝে ওপাশ থেকে লাফ দিয়ে পালিয়েছে, কিন্তু ভারি দেহ নিয়ে মীরচান্দানি আর পালাতে পারেনি। মালপত্র সমেত ধরা পড়ে সে।

সুমিত আজ ওকে ধরে গর্জে ওঠে।

—ঠিক এই ভাবেই দাদাকে মেরেছিলে। আজ দেখছি তোমাকে।

পুলিশ কমিশনারও এসে পড়েন। ডি সি মিঃ দেও এসেছেন। আজ কমিশনার সাহেব সেই এক দৃশ্য দেখে চমকে ওঠেন। সুমিত বলে।

সেদিন আমি বলেছিলাম স্যার, আমার দাদা এ্যাকসিডেন্টে মারা যায় নি। প্ল্যান করে সেই এ্যাকসিডেন্ট ঘটানো হয়েছিল তাকে মারার জন্য। আজ আবার আমি রেড করতে এসেছিলাম আমাকেও মারার জন্য ঠিক একই ভাবে সেই এ্যাকসিডেন্ট ঘটানো হয়েছিল। কিন্তু, ওদের জালে আমি পা দিই নি।

আর এসবের মূল নায়ক ইনি।

কমিশনার সাহেব অবাক হন মীরচান্দানিকে দেখে। শহরের নামী লোক, তার গুদামেই এত মাল বের হয়, আর হত্যাকাণ্ডের চক্রান্তে ও জড়িত সে।

বিজয়ও এসে সেই এক দৃশ্য দেখে অবাক হয়। বলে সে—সেদিন ঠিক বলেছিলে সুমিত।

সুমিত বলে—আর দাদাকে খুন যারা করেছিল ইনি তাদের অন্যতম।

কাগজের ফটোগ্রাফার, রিপোর্টারও এসেছে।

মীরচান্দানিকে ধরে আজ সারা সমাজে একটা আলোড়ন এনেছে তারা।

বিজয় ও যেন এবার সেই চক্রের একটাকে হাতে পেয়েছে। ভয়ে লজ্জায় চুপসে গেছে মীরচান্দানি,

পেরেরা এসে হাজির হয়েছে মালহোত্রার ওখানে, মালহোত্রা সব শুনে চমকে ওঠে।

—সেকি! রবার্ট গেল, এবার মীরচান্দানিকে ফাঁসাবে ওরা, পেরেরা বলে—আমাকে ও ধরতো, কোন রকমে পালিয়ে এসেছি। দ্যাট সুমিত ইনস্পেক্টার এ ডেনজারাস ফলো।

মালহোত্রার দলে যেন ভাঙ্গন সুরু হয়েছে। একদিকে সুনিত, ওই কমিশনার সাহেব, অন্য দিকে বিজয় তাদের উপরে ক্ষেপে উঠেছে।

তাই একটার পর একটা আঘাত করে চলেছে তারা।

মালহোত্রা ও থামবে না। এসবের মধ্যে সেও তার কায চালাবে। তাই বিকাশকেই আনিয়ে নেবে আবুধাবি থেকে, সে পারবে এবার তাদের অন্ধকারের ব্যবসা ঠিকমত চালাতে।

বিচিত্র এক গোষ্ঠী ওই কারবারীর দল। মীরচান্দানিকে এবার যেতে হবে আর তার ওই ব্যবসার কিছুটা কিছুটা আসবে মালহোত্রা আর পেরেরার হাতে

তবু মীরচান্দানিকে বাঁচাতে হবে।

কারণ তাদের অনেক গোপন খবর সে জানে, পুলিশকে ফাঁস করে দিলে বিপদই বাড়বে তাদের।

পেরেরা বলে—একটা চান্স মিস্ করলাম মালহোত্রাজী, মালহোত্রা বলে—ভুল করেছে পেরেরা। এখন সবাই না বিপদে পড়ি। বিজয় সাব্ ভি বিগড়ে গেল। ও থাকলে মীরচান্দানিকে বের করে আনতো।

পেরেরা বলে—দরকার হয় সব সে বড়া ব্যারিষ্টার দেগা।

মালহোত্রা তবু আশার আলো দেখে না। আজ বিপদেই পড়েছে সে।

তবু চেষ্টার ত্রুটি করে নি।

গোপালবাবু এর মধ্যে তাদের কাগজে পুলিশের জুলুমের কাহিনী নানা ভাবে লিখেছে। মীরচান্দানি তাদের দলের লোক, সমর্থক। তাই দলের চক্রান্তে তার মত সৎ দেশ সেবককে পুলিশ এই অপবাদ দিয়ে জেলে পুরতে চায়। তার চরিত্র হনন করতে চায়।

গোপালবাবুই তোড়জোড় করে ব্যারিষ্টার দাঁড় করিয়েছে।

এদিকে সরকারী পক্ষে দাঁড়িয়েছে বিজয় সেন। সে ওদের সব খবরই জানে। আজ সুমিতও অনেক খবর এনেছে। রবার্ট এর কাছে ওজেনেছে ওদের মালপত্র কি ভাবে আসে, কোথায় কোথায় পাচার হয়। তেমনি দু একটা কেন্দ্রে সার্চ করে মীরচান্দানীর সই করা চিঠি, বিলও পেয়েছে।

আর পুলিশও এবার অমিত রায়ের মার্ডার কেসের পুরোনো ফাইল বের করেছে।

মীরচান্দানীর ব্যারিষ্টার বলে।

—এতো হারা মামলা। গুদাম ওর নামে, সেখানে এসব বেআইনী মাল পেয়েছে, ওকেও স্পটে ধরেছে।

এ কেসে করার কিছু নেই।

মালহোত্রা ভাবনায় পড়ে।

আর আদালতে ও তাই হয়। বিজয়ের তীক্ষ্ণ সওয়ালে সেই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। মীরচান্দানিই বেআইনী মালের কারবারী।

সব মাল সরকার আবার সিজ করে, পঁচিশহাজার টাকা জরিমানা দিয়ে বের হয়ে আসে মীরচান্দানি।

সে কোর্ট থেকে বের হবার পরই পুলিশ তাকে আবার

এ্যারেষ্ট করে পুলিশ অফিসার সুমিত রায়কে পরিকল্পিত ভাবে হত্যার চেষ্টার জন্য, আর অতীতের পুলিশ অফিসার অমিত রায়ের হত্যার কেসটাতেও এবার জড়িয়েছে তাকে।

ব্যারিষ্টার সাহেব জামিনের জন্য আবেদন করতে বিজয় উঠে বিরোধিতা করে।

—আসামী প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি, প্রাথমিক তদন্ত শেষ না হওয়া অবধি ওকে জেল হাজতে রাখার আদেশ দেওয়া হোক। নাহলে এ কেসের তদন্তের অসুবিধা হবে।

জজ্‌সাহেব ও সেই আদেশ দেন।

অর্থাৎ মীরচান্দানিকে আপাততঃ কিছু দিনের জন্যও হাজতে রাখতে পেরেছে বিজয়।

সুমিত ও খুশীহয়েছে, তার দাদার হত্যার আবার নোতুন করে তদন্ত হবে।

মালহোত্রা, পেরেরার দল এবার প্রমাদ গণে! তাদের এতদিনের অন্ধকারের সাম্রাজ্যে এবার যেন ফাটল ধরাতে চায় ওই সুমিত আর বিজয়।

গোপালবাবু ও এসে হাজির হয়েছে।

তাদের অদৃশ্য হাতের কারসাজি গুলোকে ও ব্যর্থ করে দিতে চায় বিজয় সেন।

পেরেরা কঠিন একটা মানুষ।

সে বলে—বিজয় সুমিতের সাধ্যে হবেনা বস্, আমরা যেমন কারবার করছিলাম করবোই—

গোপালবাবু বলে—কাগজে পুলিশের কেচ্ছা কাহিনী এই সা ফাঁস করবো বাধ্য হয়েই কমিশনার ওই সুমিতকে এখান থেকে বদলি করবে। আর মীরচান্দানির কেস নিয়ে আমাদের দল এসে

এসেমব্লিতে কোশ্চেন তুলবে। মিথ্যা ষড়যন্ত্রে তাকে জড়ানো হয়েছে রাজনৈতিক কারণে।

আর দল এবার জিতলে দেখে নোব ওদের। তাই বলছিলাম মালহোত্রাজী দলকে জেতাতেই হবে। কিছু বেশী টাকা খর্চা করতে হবে।

মিঃ মালহোত্রার মত লোকরা দেশের রাজনীতির খেলাতে বড় দানই ফেলে। তাই সে অরাজী নয়।

আর ব্যবসাকে বাড়াবার জন্য যোগ্য সহকারী হিসাবে বিকাশকে ফিরিয়ে আনছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ থেকে।

পুলিশের নজর এখন সবদিকেই।

নদীর দিকে। এয়ারপোর্টেও কড়া নজর রেখেছে। পুলিশও বেশ বুঝেছে রবার্টসন্, মীরচান্দানীর মত লোকরা দলে ভারি, ওদের কয়েকজনকে ধরেছে মাত্র। বাকী চারিদিকে তারা এখনও রয়ে গেছে। আর মালের সূত্র ধরেই তাদের খুঁজে বের করা যাবে।

তাই কড়া পাহারা রেখেছে চারিদিকে।

বিকাশ বেশ কিছু দিন পর বাবার কাছ থেকে দেশে ফেরার নোটিশ পেয়েছে। মনে হয় বিজয় বাবুদের সেই কেসের তদন্ত গড়বড় হয়ে গেছে। তার পিতৃদেব কলকাঠি নেড়ে সব পথ পরিষ্কার করে এবার সুপুত্রকে ঘরে ফিরতে বলেছেন।

তাই নিশ্চিন্ত মনে ফিরছে বিকাশ সঙ্গে একটা বিদেশী রঙীন টি ভি।

এয়ারপোর্টে নেমে ইমিগ্রেশন চেক করিয়ে পাশপোর্টে ছাপ ছোপ লাগিয়ে দেশে ঢোকার পর এবার কাষ্টমস্ চেকিং এর জন্য এসেছে। কাউন্টারে অন্যদের মাল পত্র চেকিং হচ্ছে।

বিকাশ ডিউটি দিয়ে কাগজপত্র নিয়ে টি ভি টা নিয়ে বের হয়ে

আসবে, এদিক ওদিক দুচার জন কাষ্টমস্ অফিসার ঘুরছে। তারা ক্লিয়ারেন্সের পর ও যাত্রীদের উপর নজর রাখে।

হঠাৎ একজন অফিসার বিকাশকে বলে—দাঁড়ান। টি-ভি টা দেখতে হবে।

বিকাশ কড়াস্বরে জানায়—ক্লিয়ারেন্স করে এলাম, এইতো কাগজ পত্র।

কিন্তু কাস্টমস্ অফিসার বাধাদেয়—আমরা দেখবো সেটটা। খুলুন।

বিকাশ এবার ঘাবড়ে যায়। ওরা প্যাকিং খুলে সেটের পিছনের ডালাটা খুলছে, বিকাশ মলেহোত্রা জানে ওর মধ্যে কি বস্তু আছে। ভেবেছিল পার করে নিয়ে চলে যাবে, কিন্তু এভাবে বাধা পাবে ভাবেনি।

সেটের মধ্যে যন্ত্রপাতির বদলে আছে সোনার বিস্কুট।

কয়েক লাখ টাকার সোনাই পাচার করে আনছিল-কিন্তু হাতে নাতে ধরা পড়ে যাবে তা ভাবেনি।

ওদের পিছনের ডালা খুলতে ব্যস্ত থাকার সময় বিকাশ ও মাল ফেলে এবার দৌড়ে বাইরের ভিড়ে মিশে যাবার চেষ্টা করে।

পুলিশ ও সজাগ হয়েই ছিল।

কর্মব্যস্ত এয়ারপোর্ট লাউঞ্জের এদিক ওদিকে দৌড়ে বিকাশ পালাবার চেষ্টা করছে, পিছনে তাড়া করেছে পুলিশ, কাষ্টমস্ এর লোকরা।

বিকাশ তবু প্রাণপণ চেষ্টা করছে। বাইরে তাদের গাড়ি আর বিশ্বস্ত লোককেও দেখেছে, কোনরকমে বের হতে পারলে এরা আর তার পাত্তাই পাবেনা।

কিন্তু সে পথে এগোতে পারে না বিকাশ মালহোত্রা, ওকে তাড়া করে কোণঠাসা করে ধরেছে।

সেটের ভিতরও প্রচুর সোনার খবরটাও ততক্ষনে জানা জানি

হয়েছে। বিকাশ মালহোত্রার তরী তীরে এসে ডুবেছে এই ভাবে।

পুলিশ সোজা ওকে থানার লকআপে পাঠিয়েছে।

মালহোত্রা ছেলের জন্য অপেক্ষা করছে। এখন তার সামনে অনেক কায। বিকাশকে তাই দরকার।

আজকের ফ্লাইটে ফেরার কথা, গাড়িও গেছে এয়ারপোর্টে।

মিঃ পেরেরা ও এসেছে মীরচান্দানীর কেসের ব্যাপারে।

গোপালবাবু বলে—এবার অন্য ব্যারিষ্টার দিচ্ছি, কড়া লোক সে মীরচান্দানীর জামিন হবেই তারপর দেখাযাবে মামলা উঠলে। ফাইলই লোপাট হয়ে যাবে।

মালহোত্রা বলে—যে ভাবে হোক মীরচান্দানিকে বের করতেই হবে। ইজ্জতের সওয়াল।

গোপালবাবু বলে—চেষ্টা তো করছি স্যার।

হঠাৎ রুস্তম এসে খবরটা জানায়। এয়ারপোর্টে বিকাশের মালসমেত এ্যারেষ্ট হবার খবর শুনে চমকে ওঠে মালহোত্রা।

—ননসেন্স। ব্লাডি ফুল।

গোপালবাবু চমকে ওঠে। কথাটা তার উদ্দেশ্যে বলা কিনা কে জানে। মালহোত্রা তখন রাগে ফুঁসছে। বলে সে।

—ওই বিকাশের কথা বলছি। সব সময়ই একটা না একটা কেলেঙ্কারী বাধাবেই। সঙ্গে করে নিজে এভাবে মাল আনে কেউ? এখন কি হবে?

ওরা সমাজের সুপরিচিত ব্যক্তি।

যা কিছু অন্ধকারের কাজ করে তা অন্যলোককে দিয়ে করায়। নিজেরা থাকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে, যাতে তাদের গায়ে হাত না পড়ে।

কিন্তু বিকাশ নিজেকেই এই প্রকাশ্য কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে ফেলেছে আজ।

মালহোত্রার মত শিল্পপতির পারিবারিক মানসম্মান ও জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে।

গোপালবাবু সব শুনে বলে—সত্যিই খুবই বিপদের কথা। মালহোত্রা বলে—এখন ওকে বাঁচাতে হবে।

পেরেরা বলে ওঠে—ব্যারিষ্টার দাসকে দেখছি

মালহোত্রা দেখেছে ব্যারিষ্টার দাসের এলেম, ওর তুলনায় বিজয় সেন অনেক ছুঁধে এ্যাডভোকেট, তাকে কেস দিয়ে কখনও হারেনি মালহোত্রা বলে।

—ওসব দিয়ে হবে না পেরেরা, বিজয়বাবুকে রাজী করাতে হবে যে ভাবে হোক, বিকাশের কেস নিতে। একমাত্র ওই পারবে এ কায সম্ভব করতে। বিজয় বাবুকেই চাই।

পেরেরা ভাবনায় পড়ে। জানে বিজয় সেন এখন তাদের উপর ক্ষেপে আছে। মিঃ মালহোত্রা ও জানে আসল কারণটা। বিকাশের জন্যই আজ বিজয় বাবুকে ও হারিয়েছে। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করার সাধ্য নেই। বিজয়ের স্ত্রীর হত্যার মামলাকে তারাই সুকৌশলে চাপা দিয়েছে। কিন্তু বিজয় সেন সেটা ভোলেনি।

পেরেরা বলে—কিন্তু বিজয় সাব্ কি রাজী হবেন?

গোপাল বাবু বলে—কাল চলুন মালহোত্রাজী, আপনার ছেলের ব্যাপারে চাপ দিলে রাজী হবেন। তিনি এ কেস নিলে জামিনে ঠিক বের করে আনবেন কেসে ও জিতবেন।

রেবা এখন ধীরে ধীরে সুস্থ হয়েছে কিছুটা। প্রকৃতির নিয়মের মধ্যেই এই সহনশীলতা আছে। মানুষের মনে ও তার ছায়া পাত করে। তাই মানুষ শোক দুঃখ ভুলে আবার বাঁচার স্বপ্ন দেখে। একটা বয়সে বিশেষ করে যৌবনের সামনে বাঁচার আশাটা প্রবলই থাকে। বার্দ্ধক্যের আঘাত মনের গভীরে বসে যায়, তার অস্তগামী দিনের শেষ বেলায় সেই দুঃখকে ভোলার মত শক্তি থাকে না। কিন্তু

যৌবন ভালোবাসার স্বপ্ন দেখে, তাই রেবা ও একটু সহজ স্বাভাবিক হয়ে আসছে। এর জন্যে কৃতিত্ব সুমিতের ও কম নয়।

বিজয় ও সেটা দেখেছে। রেবা ও ভালোবাসে সুমিতকে। সুমিত ও তার ওই পুলিশ জীবনের একঘেঁয়ে কঠিন পরিশ্রমের মধ্যেও যেন এতটুকু সবুজের স্বপ্ন দেখে রেবাকে কেন্দ্র করে। রেবা ও এখন সংসারের ভার, তনুশ্রীর ভার নিয়েছে। সুমিত ডিউটিতে যাবার আগে বিজয়কে খবরটা দিতে এসেছে।

বিজয় ও সকালের কাগজে দেখেছে মালহোত্রার ছেলে বিকাশ মালহোত্রার এ্যারেষ্টের খবর। প্রচুর বেআইনী সোনা সমেত এয়ার পোর্টে ধরা পড়েছে।

সুমিত বলে—আমাদের লক্ আপেই রয়েছে রাজপুত্র। এবার হাতে নাতে ধরা পড়েছে পালের একটা গোদা।

বিজয় ও এই সুযোগ খুঁজছিল। বলে সে—এবার মালহোত্রার গুদাম বাড়ি সার্চ করো সুমিত জলদি। মাল কিছু পাবে তারপর দেখছি ওদের কে ছাড়ায়?

রেবা চা আনে।

বলে সে—বাড়িতে ও ওই সব মামলার কথা?

ওই বিরক্তিটা ছিল লেখার মধ্যেও রেবা বলে—ওসব ছেড়ে এবার তনুর জন্মদিনের অনুষ্ঠানের কথা ভাবো। আজ ওর মা নেই।

বিজয় ওর একমাত্র মেয়ের জন্মদিনের কথা ও ভুলে গেছল। রেবার কথায় বলে। —তাই নাকি? তাহলে বল কি করতে হবে। হরিপদ দা আছে। গণেশবাবু সরকার মশাইকে বল।

রেবা বলে—ওদের বলছি কিন্তু তোমাদের ও জানাচ্ছি সেদিন সন্ধ্যাতে কোন কায রেখো না।

সুমিত বলে—নিশ্চয়ই আসবো।

হঠাৎ এই শান্ত সুন্দর পরিবেশের মধ্যে মালহোত্রা, গোপাল

বাবুকে ঢুকতে দেখে একটু কঠিন হয়ে ওঠে বিজয়। তনুশ্রী বাবার কাছে দাঁড়িয়েছিল। রেবা ও

রেবা ওদের দেখছে। বোধহয় কোন জরুরী দরকারেই এসেছে. বিজয় বলে—তনু মা তোমরা একটু যাও।

সুমিত দেখছে মালহোত্রাকে। জানে কেন এসেছে সে। কিন্তু এও জানে বিজয় দা কি জবাব দেবে। সুমিত এই পরিস্থিতির মধ্যে থাকতে চায় না।

বলে সে—তাহলে এখন চলি বিজয়দা।

রেবা তনুশ্রীর সঙ্গে সুমিত ও বের হয়ে এল। বিজয়ের লাইব্রেরীতে একটা সাময়িক স্তব্ধতা নামে। এদের উভয় পক্ষের মধ্যে অদৃশ্য একটা কঠিন ব্যবধানই গড়ে উঠেছে।

বিজয় চাইল—বলুন ?

গোপাল বাবু বলে—কাগজে দেখেছেন খবরটা, মিঃ মালহোত্রা তাই ছুটে এসেছেন, ওর ছেলেকে পুলিশ এ্যারেষ্ট করেছে। ছেলেকে বাঁচান। ওর মত নামী লোকের মান সম্মানের প্রশ্ন জড়িত, তাই বাধ্য হয়েই এসেছেন আপনার কাছে।

বিজয় এর মনে আজ ঝড় ওঠে। সে ও একদিন অসহায় অবস্থায় কাতর আবেদন করতে গেছল ওর কাছে। কিন্তু সে আবেদনে কর্ণপাত ও করেনি মালহোত্রা।

উলটে রহস্যজনক ভাবে সেখানের দারোগাকেই বদলি করে একজন জুনিয়ার লোককে পাঠানো হয়েছিল। তার তদন্তের রিপোর্ট দেখে বেশ বুঝেছিল বিজয় এতে মামলা দাঁড়াবে না।

তার স্ত্রীর হত্যার কোন বিচারই হাত দেয়নি কোন অদৃশ্য অন্ধকারের মানুষরা। সেই পথের একজন আজ এসেছে তার কাছে তার বংশের সম্মান বাঁচানোর জন্য, তার ছেলেকে জেলের হাত থেকে বাঁচানোর আবেদন নিয়ে।

—গোপালবাবু বিজয়কে চুপ করে কি ভাবতে দেখে বলে।

এত কি ভাবছেন স্যার? টাকা যত লাগে পাবেন। দশ বিশ পঁচিশ হাজার।

বিজয় বলে ওঠে—আপনাদের কোন কেস আমি করবো না আগেই বলেছি মিঃ মালহোত্রা, আজ ও সেই কথাই বলবো।

মিঃ মালহোত্রা বলে ব্যাকুল ভাবে।—আমার একমাত্র ছেলের জন্য আজ এসেছি মিঃ সেন, আমার বংশ মর্য্যাদার কথা ভেবে।

বিজয় ফেটে পড়ে—আমার স্ত্রীর হত্যার পর ও গেছলাম আপনার কাছে, আমার মান ইজ্জৎ সেদিন রাখার কথা এতটুকু ও ভাবেননি। আজ এসেছেন আপনার ইজ্জৎ বাঁচাতে আমার কাছে? দয়া করে আপনি যান। আমি এ কেস নেব না। নিতে পারবো না।

গোপালবাবু তবু বলার চেষ্টা করে।

—যা হবার হয়ে গেছে। এবারের মত মাপ করে দিন।

বিজয় এর চোখের সামনে লেখার প্রাণহীন দেহটার ছবি ফুটে ওঠে। দুচোখে তার নিদারুণ ঘৃনা। সেই জ্বালা এখন ও ভোলেনি বিজয়। তাই বিজয় এ কায করতে পারবে না। বলে সে।

—আমার শেষ কথা আমি বলছি। নমস্কার!

অর্থাৎ তাদের চলে যেতেই বলেছে বিজয় কড়া ভাবে। মিঃ মালহোত্রা উঠে বাইরে আসছে গোপাল বাবুর সঙ্গে। মালহোত্রার মনে রাগটা চেপে ওঠে। কিন্তু বাইরে তার কোন প্রকাশ নেই। হঠাৎ বাগানের মধ্যে শব্দ শুনে চাইল মালহোত্রা। রেবা আর তনুশ্রী রয়েছে। ছোট্ট সুন্দর ফুলের মত মেয়েটা ওই ফুলের মাঝে যেন উজ্জ্বল একটি ফুল হয়ে বিকশিত হয়ে রয়েছে।

বিজয় সেনের শূন্য জীবনে ওই তনুশ্রীই একমাত্র সান্ত্বনা। আবার তার জন্যই বিজয়ও সব ভুলে বাঁচার চেষ্টা করেছে।

তনুশ্রী হাসছে। বিজয় বের হয়ে এসেছে বাগানে। মেয়ে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে।

বিপন্ন, ক্ষুব্ধ মালহোত্রা দেখছে ওই সুন্দর দৃশ্যটা। গোপাল বাবুর ডাকে চমক ভাঙে তার। গোপালবাবু ও হতাশ হয়ে মনে মনে রেগে উঠেছে। বলে সে—চলুন মিঃ মালহোত্রা দরকার হয় ব্যারিষ্টার দাসের ওখানেই যেতে হবে।

মালহোত্রার খেয়াল হয়। গাড়িতে উঠতে উঠতে কি ভাবছে সে। তার মত কঠিন লোভী একটা মানুষ নিজের স্বার্থে যা কিছু হোক করতে ও দ্বিধা বোধ করে না। আজ তার পথ সে পেয়েছে।

সে পথটা ঠিক সোজা সহজ পথ নয়। কিন্তু তার মত লোকের পক্ষে এই পথ নেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

বাড়ি বাগান ওই তনুশ্রী সবকিছুকে দেখছে মালহোত্রা নিবিষ্ট মনে। গাড়িটা বের হয়ে এল। গোপালবাবু মালহোত্রাকে গম্ভীর ভাবে কি ভাবতে দেখে শুধোয়।

—কি ভাবছেন ?

মিঃ মালহোত্রা আপন মনে বলে—না। কিছু না।

আজ তার চোখের সামনে এ সমস্যা সমাধানের পথ পরিস্কার হয়ে উঠেছে।

বৈকাল নেমেছে। তনুশ্রী স্কুল থেকে ফিরে এসে বাগানে খেলা করছে।

রেবা ও রয়েছে। বাড়িটা শূন্য বোধ হয় তার। বৌদি যেন সারা বাড়িটার আবহাওয়ায় কি খুশীর সুর তুলেছিল। আজ সেই সুর ও হারিয়ে গেছে।

রেবা বাগানে বসে একটা সোয়েটার বুনে চলেছে। শান্ত বাগানে বৈকালের ম্লান আলো মুছে মুছে আসছে।

গাছ গাছালির নীচে অন্ধকার জমেছে। তনুশ্রীর মনে হয় তার মা কোথায় ওই অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। এমনি নির্জনে মায়ের কথা মনে পড়ে।

পাখীদের কলরব ওঠে। মা যেন পাখীডাকা ওই নির্জন অন্ধকারে তাকে ডাকছে। তনুশ্রী কি সাহসে ভয় করে এগিয়ে চলেছে ওই দিকে।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চাইল। অন্ধকারে ঝরাপাতার উপর ভারি পায়ের শব্দ ওঠে। তনুশ্রী ওদিকে চেয়েই লোকটাকে দেখে চীৎকার করার চেষ্টা করে। লোকটাও তৈরী ছিল। লাফিয়ে এসে তনুশ্রীর মুখটা টিপে ধরে তার চীৎকার থামিয়ে দিয়ে ধমকায়—চুপ! টু শব্দ করবে না।

আরও একজন লোক আঁধার ফুড়ে এগিয়ে এসেছে। ওরা দুজনে তনুশ্রীর মুখটা টিপে ধরে ওকে কাঁধে তুলে ওদিকের পাঁচীল টপকে পিছনের নির্জন অন্ধকারে রাখা গাড়িটায় তুলে ওকে নিয়ে তারা বের হয়ে গেল।

তনুশ্রীর চীৎকার করার সাধ্য নেই, মুখটা টিপে ধরেছে ওরা একটা তোয়ালে দিয়ে। পা দুটো দাপাচ্ছে।

অন্যজন বলে—ওটাকে ক্লোরোফর্ম শুকিয়ে ঠাণ্ডা করে দে, নাহলে বিপদ ঘটাবে।

লোকটা ঝাঁঝালো গন্ধওয়ালা রুমালটা তনুশ্রীর নাকের উপর চেপে ধরেছে। দু একবার নিঃশ্বাস নিতেই তনুশ্রীর দেহটা স্থির হয়ে আসে। জ্ঞান হারায় সে।

বিজয় আদালতের কায সেরে কয়েকটা জরুরী কেসের আলোচনা করছিল তার সহকারীদের সঙ্গে। ক্রিমিন্যাল কেসই করে সে। কিন্তু কিছুদিন থেকে বড় বড় ব্যক্তিদের কেস ছেড়ে সে সাধারণ মানুষের কেসই করছে।

এতদিন ওই সাধারণ মানুষদের অনেকে বিজয়ের কাছে আসতে সাহস পায়নি, কারণ বিজয়ের মত খ্যাতিমান এ্যাডভোকেটকে প্রচুর টাকা ফি দিয়ে মালহোত্রাদের মত বড় বড় বিজনেস্ ম্যান রাই আটকে রেখেছিল।

এখন বিজয় তাদের কেস ফেরৎ দিয়ে সাধারণ মানুষের প্রতি অবিচারের, অত্যাচারের বিরুদ্ধে আইনের সাহায্য দিয়ে চলেছে।

বিজয় এ কাজে আনন্দও পায় নিজে।

এতদিন এই তৃপ্তির স্বাদ সে পায় নি। কোন শিল্পপতি তার কর্মীদের প্রতি অবিচার করে তাদের ন্যায্য দাবী উপেক্ষা করে কারখানা লক আউট করেছে।

প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা নিজের চুরি ঢাকার জন্য দরিদ্র কর্মচারীকে চোর সাব্যস্ত করেছে, বিজয় তার হয়ে আদালতে লড়ে সেই কর্মকর্তার সব কেলেঙ্কারীর কথা ফাঁস করে অন্যায়ের প্রতিকার করেছে।

সুমিত বলে—আইনের এই সত্যকার সাহায্য মানুষের দরকার বিজয় দা। আপনি তাই করছেন।

বিজয় বলে—বিচার আমি পাইনি সুমিত। তোমার বৌদির আত্মা আজ ও অতৃপ্ত রয়ে গেছে। তাই এই ভাবেই সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি।

সুমিত কি ভাবছে। বলে সে

—ক'দিন একটা কেসের এন কোয়ারীতে দিল্লি যেতে হচ্ছে। তাই যাবার আগে দেখা করতে এলাম। আজ সন্ধ্যার ফ্লাইটেই যেতে হচ্ছে।

বিজয় দেখছে সুমিতকে।

বলে সে—ঠিক আছে। রেবাকে বৌঠানের খবর নিতে বলবো। তুমিও বলো কোন দরকার হলে যেন ফোন করে।

সুমিত বলে—তাই বলেছি। তাহলে চলি বিজয়দা ফিরে এসে দেখাহবে।

বিজয় কাজ কর্ম সেরে বাড়ি ফিরছে।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তনুশ্রীকে পাওয়া যাচ্ছে না একটু আগে থেকেই।

রেবা ভেবেছে বাগানেই কোথাও রয়েছে।

কিন্তু বাগানেও দেখা মেলেনা তার। খুঁজছে এদিক ওদিকে।

হরিপদ চাকর মালীদের নিয়ে খুঁজছে।

রেবা বলে—বাইরে কোথাও যায়নিতো?

গেটে দারোয়ান ডিউটিতে থাকে। সে বলে।

—নেহি দিদি, খুকী তো বাহার গেল না।

বাগানে হঠাৎ ওদিকের গাছের একটা ভাঙ্গা ডাল দেখা যায়, ফুলের গাছগুলো মাড়ানো, তনুশ্রীর হাতের কাইভস্টার চকলেটের প্যাকেটটা ছত্রাকার হয়ে পড়ে আছে, পড়ে আছে এক পাটি জুতো এখানে, অন্যটা রয়েছে ওদিকে।

পাঁচীলের কাছে নরম মাটিতে কাদের পায়ের ছাপও রয়েছে,

রেবা চমকে ওঠে—এসব কি হরিদা?

হরিপদও দেখছে। প্রথমে ব্যাপারটা ভাবতেই পারে নি। তারপর বলে হরিপদ—ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না দিদি। মনে হয় কোন দুষ্ট লোকের কাজ। তনুশ্রীকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে।

চমকে ওঠে রেবা—সে কি?

বিজয়ও এসে পড়ে। সেও ঘটনাস্থলে এসে ব্যাপারটা দেখে চমকে ওঠে। তনুশ্রীকে কারা জোর করে ধরে নিয়ে গেছে।

বিজয় বলে—কতক্ষণ দেখিসনি ওকে?

রেবা জানায়—পাঁচটা নাগাদ দেখেছিলাম বাগানে—

বিজয় বিড়বিড় করে—ঘণ্টা খানেক আগে। চল, পুলিশকে খবরটা দিতে হবে।

মনে পড়ে সুমিতের কথা। রেবা বলে—সুমিতকে ডাকবো?

কিন্তু বিজয় জানে সুমিত নেই। বলে সে।

—ও নেই

পুলিশ বিভাগে অন্য বন্ধুদের খোঁজ করছে সে হঠাৎ ফোনটা বেজে ওঠে। বিজয় ধরেছে।

মিঃ মালহোত্রার গলা শুনে বিজয় বলে।

—এখন আমি ব্যস্ত মিঃ মালহোত্রা

মালহোত্রা—মেয়েকে বাড়িতে না পেয়ে খুব ঘাবড়ে গেছেন দেখছি।

চমকে ওঠে বিজয়। বলে সে—এ খবর আপনি জানলেন কি করে?

মালহোত্রার কাঠফাটা হাসির শব্দ ভেসে আসে ওদিক থেকে। বিজয় অবাক হয়।

মালহোত্রা বলে—আপনার খবর সব রাখি বিজয় বাবু, হাজার হোক আপনি না মানলে ও আমি কিন্তু আপনাকে বন্ধু বলেই মানি।

বিজয় ব্যাকুল হয়ে বলে।

—কোথায় আছে তনুশ্রী? কেমন আছে জানেন?

মালহোত্রা বলে—ভাববেন না। ও ভালোই আছে। ওকে একটু প্রয়োজনে আমার লোকরা তুলে এনেছে। দেখতে চান? রাত্রি আটটা নাগাদ চলে আসুন। ফেরত নিয়েও যেতে পারেন। তবে এসব খবর পুলিশকে জানাবেন না, তাহলে তনুশ্রীর বিপদ হয়ে যাবে।

বিজয় তার মেয়েকে নিরাপদে ফেরৎ চায়। তাই ওসব পুলিশের ঝামেলায় সে যেতে চায় না। বলে বিজয়।

—না না। ওসব কোন গোলমালই হবে না।

মালহোত্রা বলে—তাহলে আসুন দেখি কি করতে পারি।

রেবা এঘরে ঢুকে দাদাকে বের হতে দেখে শুধোয়।

—কোন খবর পেলে দাদা তনুর?

বিজয় রেবাকেও এসব জানাতে চায় না। সবই গোপন রাখতে চায়। বিজয় বলে—দেখি, দু একজনের কাছে গিয়ে যদি কোন সন্ধান পাওয়া যায়। কোন ফোন এলে ধরবি।

বিজয় বের হয়ে গেল।

গোপালবাবু হাসছে। মিঃ মালহোত্রা ফোনটা নামাতে মীরচান্দানি বলে—এবার বিজয় বাবুকে কব্জায় পাওয়া গেছে মালহোত্রাজী।

গোপাল বাবু বলেন।

—জোর প্যাঁচটা দিয়েছেন স্যার। বিজয়বাবুর মত মানুষ ও একেবারে ক্লিন বোলড আউট হয়ে গেছে। এবার দেখুন বিজয় সাব্ মাথা নুইতে পথ পাবে না।

বাইরে গাড়ির শব্দ হতে ওরা চাইল।

দূরে গেটে দ্বারোয়ান গাড়ি দেখে ভিতরে আসতে দিয়েছে।

শহরের বাইরে নদীর ধারে সুরক্ষিত এই বাগানের মধ্যে মালহোত্রার বিশেষ কায গুলোই সংঘটিত হয়। বিজয়কে দেখে ওরা সাদর অভ্যর্থনা করে।

—আসুন। আসুন, বিজয় বাবু।

বিজয় ছুটে এসেছে ওর মেয়ের জন্য, একমাত্র মেয়ে আজ এদের হাতে। তার মনে এতটুকু শান্তি নাই।

বিজয় শুধোয়—আমার মেয়ে কোথায় ?

মালহোত্রা বলে—আছে। দেখতে ও পাবেন। বসুন। চা—

—না। ওসবের দরকার নাই। মেয়েকে আনুন।

মালহোত্রার ইশারায় কে চলেগেল ভিতরে, একটু পরেই ইনটার কম টেলিফোনে একটা গলা শোনা যায়।

মালহোত্রা কি কথা বলে ফোনটা রাখলো।

বিজয় দেখছে বাড়িটা।

বিরাট বাড়িটাকে অতি আধুনিক ভাবে সাজানো। এয়ার কুলার লাগানো হয়েছে—ইনটারকম ফোনও রয়েছে। মেজেতে পুরু গালচে পাতা। ওদিকে বেশ বড় মত হল, সাজানো ডায়াস ও রয়েছে।

পার্টির আয়োজনও করা হয় এখানে।

বিজয় কার ডাকে চাইল—বাবা। বাবা।

তনুশ্রী ছুটে আসে বিজয়কে দেখে। বলে সে।

—ওই লোকগুলো আমাকে ধরে এনেছে বাবা। জোর করে বাগান টপকে নিয়ে এল। তুমি আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো বাবা। আমি এখানে আর থাকবো না।

বিজয় মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে তাই যাবো মা। তাইতো এসেছি। মিঃ মালহোত্রা! অনেক ধন্যবাদ। তাহলে আমি চলি।

বিজয় যাবার উদ্যোগ করতে মালহোত্রা বলে।

—একটা কথা আছে বিজয় সাব্?

বিজয় চাইল। মালহোত্রা বলে—আপনার মেয়েকে আমি ওদের হাত থেকে ফিরিয়ে দেব শুধু একটা সর্তে, আপনি আমার ছেলে বিকাশকে এবারের মত জামিনে বের করে এনে যে ভাবে হোক খালাস করে দেন।

বিজয় বলে ওঠে কঠিন স্বরে—না! আপনাদের কেস আমি নেব না।

মালহোত্রার মুখচোখ কঠিন হয়ে ওঠে।

ওর ইশারায় দুটো লোক তনুশ্রীকে ধরে বিজয়ের কাছ থেকে টেনে সরিয়ে নেয়।

কাঁদছে তনুশ্রী—বাবা! এরা আমাকে মেরে ফেলবে বাবা। বাঁচাও।

বিজয় দেখছে তার একমাত্র মেয়ে তনুশ্রীকে। তার কান্নাটা বিজয়ের বুকে এসে বাজে। বিজয় বলে ওঠে।

—মিঃ মালহোত্রা, ওই আমার একমাত্র মেয়ে।

মালহোত্রা এবার বিজয়ের সব প্রতিজ্ঞাকে ভাঙ্গার পথ পেয়েছে। পিতৃস্নেহ শাসন মানে না এটা জানে সে। তাই মালহোত্রা বলে—ওকে ফেরৎ পাবেন বিজয়বাবু, কিন্তু ওই একসর্তে। বিকাশের কেস

আপনাকে করতেই হবে। নাহলে মেয়েকে আর কোনদিনই ফেরৎ পাবেন না। নিয়ে যাও ওকে।

লোকদুটো তনুশ্রীকে নিয়ে চলে গেল। তনুশ্রীর কাতর আর্তনাদ তখন ও শোনা যায়। বিজয়ের মনের সব কাঠিন্য সেই আর্তনাদে গলে গলে পড়ছে। একটা জমাট পাথরের বুকে কি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ওরা।

মালহোত্রাজী বলে—ভেবে দেখুন। নাহলে

বিজয় এর সব শপথকে এরা চূর্ণ করে দিয়েছে। বলে সে—

—ঠিক আছে মালহোত্রাজী, তাই হবে। তবে একটি সর্তে মালহোত্রা, মীরচান্দানি, গোপালবাবুরাই জয়ী হয়েছে। মালহোত্রা ওর কথা শুনে বলে বলুন।

বিজয় জানায়—আপনার ছেলের কেসই করবো, অন্য কেস নয়। মীরচান্দানির ঘাড়ে পুলিশ অফিসার হত্যার সেই কেস ঝুলছে। ও ভেবেছিল বিজয়কে এবার হাতে পেয়েছে, তার কেসও লড়বে। কিন্তু ওই কথায় হতাশ হয়েছে সে।

মালহোত্রা জানে কি করে জাল গোটাতে হয়। সে বলে, —তাই হবে। কাল জামিনে বিকাশকে ছাড়িয়ে আনুন, মেয়েকে সন্ধ্যার সময়ই পেয়ে যাবেন।

বিজয় অবাক হয়—কাল কেন? কথা দিলাম—

মালহোত্রা বলে—আপনার মেয়ের কোন অযত্ন হবে না। সে তার চাচাজীর বাড়িতেই আছে মনে করুন। কাল জামিনে বের হবে, কাল বৈকালের পরই বাড়ি ফিরে দেখবেন আপনার মেয়ে এসে গেছে। মালহোত্রা কথা দিচ্ছে, এর নড়চড় হবে না বিজয়বাবু।

বিজয় বলে—অর্থাৎ ছেলেকে না পেয়ে আমার মেয়েকেও ছাড়বেন না?

মালহোত্রা বলে—আমি ব্যবসা বুঝি বিজয়বাবু। লেন দেন কি বাত।

বিজয় ভাবছে কথাটা। একটা দিন অপেক্ষা করতেই হবে।

মালহোত্রা বলে—পুলিশে খবর টবর দেবেন না, আমাদের কথা হয়ে গেল, ব্যস।

বিজয় বাধ্য হয়েই সেটা মেনে নিয়ে এবার মামলার কাগজপত্র নিয়ে বসেছে। কেসটাতে জিততেই হবে তাকে। তার একমাত্র মেয়ের জন্য এতবড় অপরাধীকে খালাস করে আনতে হবে। বিজয় মালহোত্রাজীকে বুদ্ধিটা বাত্‌লে দিতে মালহোত্রা কি ভেবে বলে। ব্যস। এতো মামুলি কাম। ই হোয়ে যাবে।

বিকাশকে পুলিশ লক্‌আপে রাখা হয়েছে। রাত্রির অন্ধকার নামে। বিকাশ লক্‌আপের ওই পরিবেশে হাঁপিয়ে উঠেছে। মেজেতে একটা ধুলো ভরা ময়লা কম্বল দিয়েছে—আরও ক'জন চোর পকেট-মারের সঙ্গে রেখেছে ওকে।

ওদের একজন বলে বিকাশকে

—ক্যা বে! কি করেছিলি? চোরি না পকেটমারি?

বিকাশের পরিচয় ওরা জানে না। এতবড় ঘরের ছেলে সে। আজ হাজতে আছে। হাসছে একজন চোর।

—শ্লা লবাব কা বেটে? সিগ্রেট হ্যায়?

বিকাশ চুপ করে থাকে।

হঠাৎ একটা গুলির শব্দে রাতের অন্ধকার, স্তব্ধতা খান্ খান্ হয়ে যায়। করিডরে পুলিশ একজন লোককে ধরেছে রিভলবার সমেত। লোকটা হাজতের সামনে এসে চীৎকার করছে—শালা, আমার লাখ লাখ রূপেয়ার মাল নে কাটছিলি? আজ তোকেই শেষ করে দেব।

কনেস্টবল তাকে ধরেছে। অফিসারও এসে পড়ে। লোকটা চীৎকার করছে বিকাশকে দেখিয়ে—শ্লা শয়তানের বাচ্চা। ভাবছিস আমার মাল নিয়ে পার পেয়ে যাবি? এত সোনা হজম করবি? জানসে খেয়ে লিব তোকে। ছেড়ে দিন আমায়।

পুলিশ লোকটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় ওদিকে। লোকটা তখনও চীৎকার করছে।

—আমার মাল নেবে? এতবড় হিম্মৎ।

পুলিশ অফিসারও অবাক হন, লোকটার কথায়।

—ওই টেলিভিসন সেট তোমার। বাইরে থেকে আনছিলে? এত সোনা তোমার?

লোকটা গর্জায়—নয়তো ওর বাপের? আমাকে চেনে না?

অফিসার বলে—এর ফল কি জানো? এসব বলছো?

লোকটা গর্জায়—জানি সাব্? দু' দিন পর ওর পাত্তা পেয়েছি ওকে ছাড়বো না।

আদালতে বিকাশ মালহোত্রার কেস উঠেছে।

সারা এজলাসে সাড়া পড়ে গেছে। পুলিশও এবার চেষ্টা করছে বিকাশের পিছনে আর কোন দল আছে কিনা জানার, ওকে হাতে নাতে ধরেছে। শাস্তি হবেই।

মালহোত্রারাও দলবল নিয়ে এসেছে। সকলেই অবাক হয় আজ মালহোত্রার ছেলের কেস লড়ছে প্রখ্যাত এ্যাডভোকেট বিজয় সেন।

বিজয় সেনই কাঠগড়ায় তুলেছে রাতের সেই লোকটিকে। লোকটা তখনও সমানে বলে চলেছে বিকাশকে দেখে।

—আমার মাল নিয়ে ভেগেছিল হুজুর?

বিজয় বলে—তোমার ছিল ওই সেটটা?

লোকটা পকেট থেকে কাগজপত্র বের করে দেখায়।

—এই দেখুন সাব্? ওই সেট আমি গালফ কানট্রিতে কিনে ওখানেই লাইসেন্স করিয়েছি। এই আমার নাম জগবন্ধু হালদার।

আর ও ব্যাটা আনছিল আর একটা সেট।

দুটো একই কোম্পানীর, একই মডেলের। ওই ব্যাটার কাগজ,

ওই সেটের সঙ্গে ছিল, আমার সেটে কিছু মাল আনছিলাম, ও সেটা নিয়ে চলে যাচ্ছিল আগেই।

পুলিশ অফিসার বাধা দেন—ওসব মিথ্যা ?

বিজয় কাগজপত্রগুলো দেখিয়ে বলে বিচারককে।

—ইয়োর অনার। আমার মক্কেলকে পুলিশ ওই সেট সমেত মাল সমেত ধরেছিল এটা সত্য। কিন্তু ইয়োর অনার। দুটো সেট একই মডেলের। ভুলক্রমে আমার মক্কেল ওই উচ্চবংশজাত অল্প বয়সী তরুণ নিজের সেটের বদলে দুর্ভাগ্যক্রমে এই জগবন্ধু হালদারের সেটটা তুলে নিয়ে এই অপরাধের ভাগী হয়েছে।

মক্কেল-এর বংশ পরিচয় শহরের সকলেই জানেন এমন জঘন্য কায তার পক্ষে করা সম্ভব নয়। কিন্তু ভুলবশতঃ সে এই কায করেছে। তাছাড়া জগবন্ধু হালদার নিজে বারবার স্বীকৃতি দিয়েছে এটা ওর মাল, আদৌ বিকাশ মালহোত্রার নয়।

সুতরাং সবদিক বিবেচনা করে আমার মক্কেল নিরীহ, নিরপরাধ ওই তরুণকে এই জঘন্য অভিযোগ থেকে মুক্ত করে ওই জগবন্ধু হালদারকেই এই স্মাগলিং কেসের আসামী করা হোক।

সরকারী উকিল গর্জে ওঠে ইয়োর অনার।

বিজয় আবেদন করে—এই সব কাগজ পত্র থেকে এবং জগবন্ধু হালদারের বক্তব্য থেকেই আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে ইয়োর অনার, সরকার পক্ষের সেই যুক্তি নাকচ করার মত কোন প্রমাণই নেই। বিকাশ মালহোত্রা এখানে সম্পূর্ণ নির্দোষ। তার ভুলও প্রমাণিত।

কিছু করার নেই। জগবন্ধু হালদার নিজে সব স্বীকার করেছে, সেও ওদেশ থেকে একই প্লেনে এসেছে। সুতরাং জজ্ সাহেব তাকেই আসামী সাব্যস্ত করে বিকাশকে সবদিক বিবেচনা করে বেকসুর খালাস এর আদেশ দেন।

খুশীতে ফেটে পড়ে মালহোত্রা। এমন কেস এত সহজে ডিসমিস

করিয়ে দিতে পারে একমাত্র বিজয় সেনই। গোপালবাবুর কাগজের রিপোর্টার ফটোগ্রাফার ও রেডি ছিল তারা ছবি তুলছে।

বিজয় ক্লান্ত হয়ে বের হয়ে আসে এজলাস থেকে।

বারের উকিলরাও এসেছে ধন্যবাদ জানাতে, মালহোত্রাজীও খুবই আনন্দিত। বিকাশ বিজয়কে নিয়ে ছবি তোলায়।

বিজয়ের এসব ভালো লাগে না।

ভিড়ের বাইরে এসে মালহোত্রাকে বলে।

—আপনার কেস জিতিয়ে দিয়েছি। আমার মেয়েকে আজ পাবো তো?

মালহোত্রা, মীরচান্দানি, পেরেরাও রয়েছে। ওরা কি ভাবছে। মালহোত্রা বলে—নিশ্চয়ই। বাড়ি গিয়ে দেখবেন আপনার মেয়ে বাড়ি পেঁৗছে গেছে।

বিজয় তনুশ্রীকে ফেরৎ পাবে, সেই আশাতেই এতবড় কেসের জয়টাকেও মেনে নিতে পারে না। তার কাছেও এটা বিশ্রী বোধহয়। এতবড় একটা অন্যায়কে সে নানা কৌশলে আইনের চোখে মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে বাধ্য হয়েছে। নিজের উপরই ঘৃণা বোধহয়।

কিন্তু ওই শয়তানের দল তার একমাত্র মেয়েকে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে তার বিবেক নীতি বোধকে মূল্যবান বস্তু হিসাবে কিনে নিয়েছে।

বিজয় বাড়ি ফিরে রেবাকে দেখে শুধোয়—তনুশ্রী আসেনি?

রেবা একটু অবাক হয়। তনুশ্রীর আসার ব্যপারটা রেবাকেও জানায়নি বিজয়। রেবা বলে—কই আসেনি তো? ওর কোন খবর পেলে দাদা?

বিজয়ের জবাব দেবার মত মানসিক অবস্থা নেই।

মালহোত্রার ছেলেকে সে নানা কৌশলে আজ খালাস করিয়ে এনেছে। তার কথা রেখেছে কিন্তু মালহোত্রা তার কথা রাখেনি।

ওদের বিশ্বাস করে না বিজয়।

তাই কি ভেবে রেবার কথার জবাব দেয়—না। আমি আসছি।

রেবাও দাদাকে চিন্তান্বিত দেখে তাকে বের হতে দেখে বলে সে।

—আবার কোথায় চল্লে দাদা?

বিজয়ের সারা মনে ঝড় উঠেছে।

বলে সে—আসছি। দেরী হবে না।

মিঃ মালহোত্রার বাড়িতে আজ খুশির সাড়া পড়েছে। ছোট খাটো পার্টিই বসেছে। মীরচান্দানি, গোপালবাবু, পেরেরা আরও দুএকজন বিশ্বস্ত লোকও রয়েছে।

মালহোত্রার প্ল্যানটা শুনে গোপালবাবু বলে।

—দারুণ মতলব করেছেন মিঃ মালহোত্রা। মীরচান্দানিজী, মিঃ পেরেরা, মালহোত্রা সাহেব কি আপনাদের না দেখে পারেন? দেখবেন এবার সব ব্যবস্থাই হয়ে যাবে।

মীরচান্দানিও খুশী হয়। বলে সে।

মিঃ মালহোত্রা আপনার এই উপকার কোনদিনই ভুলবো না। যত মাল চান সব আমি এনে দেব।

—মিঃ পেরেরাও ভরসা পেয়েছে। সে বলে

—জরুর। আমিও আপনার হয়েই কাজ করবো মিঃ মালহোত্রা।

বিজয় সাহেবকে হাতে আনুন। এবার কানুন মেরা মুট্টিমে আ যায়েগা। উঃ বিকাশের কেস ক্যায়সা মতলব ভেস্তে দিল! এ গ্রেট ম্যান উ বিজয় সাব্।

হঠাৎ ওই পান ভোজনের আনন্দমুখর জগতে বিজয় সেনকে ঢুকতে দেখে ওরা একটু হতচকিত হয়ে যায়।

মালহোত্রা দেখছে ওকে। গোপালবাবুর মত লোকের চোখের চামড়া নেই। সে পরগাছার জাত। তাই লাজ লজ্জাও কম। গোপালবাবু পরম আত্মীয়ের মত আপ্যায়ণ করে।

—আসুক বিজয় বাবু। আপনার কথাই হচ্ছিল।

এ গ্রেট ম্যান মশায় আপনি। একেবারে জিনিয়াস। কি

কৌশলে এমন পাকা কেসকে কাঁচালেন, কাগজে ত তাই বলেছি একটা স্পেশ্যাল কলম লেখা বাপু। বসুন! একটু গলা ভিজিয়ে নেন—

বিজয় ওর কথার জবাব না দিয়ে সোজা মালহোত্রার কাছে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো। দেখছে ওকে।

মীরচান্দানি, পেরেরাও যেন বিজয়ের কঠিন ব্যক্তিত্বের সামনে একটু চুপসে গেছে।

বিজয় শুধোয়—মিঃ মালহোত্রা, আমার মেয়েকে এখনও ফিরে পাইনি কেন?

মিঃ মালহোত্রা বলে—পাবেন।

বিজয় একটু কঠিন স্বরে বলে—আমার কাজ আমি পুরো করেছি। আপনি আপনার কাজ মোটেই করেন নি। তনুশ্রীকে এনে দিন। ওকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি।

মীরচান্দানি, মালহোত্রাদের মধ্যে চোখা চোখি হয়।

মীরচান্দানি বলে—বসুন। পাবেন মেয়েকে।

বিজয় ওদের দিকে না চেয়ে মালহোত্রাকে বলে।

—কই আনুন তাকে।

মালহোত্রা এবার স্বমূর্তি ধরেছে। এতবড় অন্ধকারের ব্যবসার কর্ণধার সে! মালহোত্রা কৌশলী, ক্রুর। বলে সে।

—মীরচান্দানি আমার বন্ধু, পুলিশ মার্ডারের কেস ঝুলছে ওর নামে, পেরেরার নামে জালিয়াতির কেস আছে। তাদের খালাস করুন, আপনার মেয়েকে পাবেন।

বিজয় এবার চমকে ওঠে। দেখছে সে ওই শয়তানদের। সেদিন মালহোত্রাকে চিনতে পারেনি। আজ তাকে হাতে পেয়ে এইভাবে আটকে ফেলেছে। বিজয় বলে।

—কিন্তু একথা ছিল না। আপনার একটা কেসই করার কথা ছিল, তা করেছি। আমার মেয়েকে আমি চাই—

হাসে মালহোত্রা।

—পাবেন। কিন্তু আমার বন্ধুদেরও বাঁচাতে হবে।

বিজয় তীক্ষ্ণস্বরে বলে—নাহলে আমার মেয়েকে পাবো না?

মালহোত্রা আনমনে টেবিলে আঙ্গুল দিয়ে টোকা তুলতে থাকে। অর্থাৎ তার যা বলার তা বলা হয়ে গেছে।

অসহায় রাগে জ্বলছে বিজয়। ইচ্ছা হয় এক একটা শয়তানকে সে নিজের হাতে শেষ করতে পারলে খুশী হয়। আইনকে ওরা এই ভাবে কিনে নিয়েছে।

বিজয় আজ বেশ জেনেছে এখানে আবেদন নিবেদনও কোন ফলই হবে না। তাই বের হয়ে আসছে সে।

মালহোত্রা বলে—আমার কথাটা ভেবে দেখবেন বিজয় বাবু, আর পুলিশে গেলে আমরা তখুনিই খবর পাবো। তারপর আর আপনার মেয়েকে কোনদিনই কেউ খুঁজে পাবে না। আমাকে নিশ্চয়ই চেনেন। তাই বলছি বন্ধুর মত চলুন। আগেকার মতই, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

বন্ধু! বিজয় সেন জীবনে একটা মস্ত ভুল করেছে এতদিন। আজ ও তারই প্রায়শ্চিত্ত করবে সে। ওই শয়তানদের মুখোস সে খুলে দেবে তাতে তার যা ক্ষতি হয় হোক।

বের হয়ে আসে সে।

রাতে ঘুমও ঠিক হয় না বিজয়ের।

স্ত্রী লেখার ছবিটা যেন আজ বারবার তার দিকে নীরব চাহনি মেলে ধিক্কার দিচ্ছে।

বিজয় কাপুরুষ, তার স্ত্রীর সম্মানও রাখতে পারে নি। আজও তার উপর এতবড় অন্যায়ের কোন প্রতিকার করতে পারেনি। সেই জঘন্যতম অপরাধের আসামীকে খুঁজে বের করতেও পারেনি।

তার একমাত্র মেয়েকেও রক্ষা করতে পারেনি।

আজ সেই আদরের তনুশ্রী কোন শয়তানদের হাতে বন্দী হয়ে আছে। বাবা হয়ে তার মেয়েকে উদ্ধার করতে পারেনি।

বিজয় সেনও আজ সমাজের একটা ধনবান লুঠেরাদের হাতে যেন বন্দী হয়ে পড়েছে। শয়তানেরা তাকেও আজ ওদের হাতের মুঠোয় বন্দী করে তাকে দিয়ে ওদের সব অন্যায়ের আইনতঃ সমর্থন চায়।

সকালে বাগানের সামনে বারান্দায় বসে আছে বিজয়। আজকের দিন শুরু হয়েছে। আলো জাগে, পাখীর ডাক শোনা যায়। বিজয়ের কাছে এসবের সব সাড়াই আজ হারিয়ে গেছে।

হঠাৎ কার গাড়ির শব্দ শুনে চাইল।

সুমিত নামছে গাড়ি থেকে। ওর হাতে একটা খবরের কাগজ।

সুমিত কাল সন্ধ্যার ফ্লাইটে ক'দিন পর দিল্লী থেকে ফিরেছে।

রাত হয়ে গেছল, কাল আসতে পারেনি।

সুমিত আজ সকালের কাগজেই মিঃ মালহোত্রার ছেলে বিকাশের গোল্ড স্মাগলিং কেসটাকে এভাবে ফেসে যেতে দেখে চমকে ওঠে। হাতে নাতে ধরেও পুলিশ তাকে সাজা দেওয়াতে পারেনি, তাকে আদালত প্রমাণ অভাবে বেকসুর খালাস করে দিয়েছে।

আরও চমকে ওঠে সুমিত এই কেস করেছে বিজয় সেনই। বিজয়দা হঠাৎ আবার মালহোত্রাদের দলেই ফিরে গেছে একথাটা ভাবতেও পারে না সুমিত।

তার সব ধারণা গুলো বদলে গেছে বিজয়দার সম্বন্ধে। ওই কাগজে বিজয় আর বিকাশের ছবিও ছাপা হয়েছে। শহরের অন্যতম সৎ, অভিজাত পরিবারের সুনাম বিপন্ন করার চেষ্টার কথাও বলা হয়েছে তাতে।

সুমিত তাই সকালেই কাগজখানা হাতেকরে ছুটে এসেছে। বিজয় ওসব জানে না। সে বরং খুশীই হয়েছে সুমিতকে দেখে। বলে বিজয়—বসো।

সুমিতের মনের বিক্ষোভটা এবার ফেটে পড়ে।

বলে সে—বসতে আসিনি বিজয়দা। কি করে? কেন আবার ওই শয়তানদের দলে ফিরে গেলেন? আবার ওদের হয়ে এতবড় অপরাধীকে ছাড়িয়ে আনলেন ভাবতে পারছি না বিজয়দা।

টাকা। টাকার লোভে শেষ অবধি ওদের কাছে নিজের ন্যায় নীতি-বিবেক বিক্রী করলেন? ছিঃ ছিঃ

বিজয় অবাক হয়ে গেছে। বলে সে—একি বলছো সুমিত? জানায় সুমিত—ঠিকই বলছি। আপনাকেই বড় দাদার মত সম্মান করতাম, আজ দেখছি আপনি তার ও অযোগ্য।

বিজয় যেন বলার চেষ্টা করে।

—বিশ্বাস কর সুমিত, এছাড়া আমার পথ ছিল না।

সুমিতের কণ্ঠে দুঃখ, বেদনা ঘৃণার সুর। বলে সে।

—আমার সব ধারণা, সম্মানকে আজ ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন। এত লোভী, নীচ আপনি তা জানতাম না। দেখুন আজ ওদের কাগজে কত জয়গান করেছে আপনার। তাই নিয়েই খুশী থাকুন। আমি চললাম।

বিজয় ওকে বলার চেষ্টা করে।

—শোন, শোন সুমিত। তোমাকে কিছু বলার আছে।

সুমিতের ওসব শোনার মত মানসিক অবস্থা নেই। বলে সে।

—আপনার বলার আর কিছু থাকতে পারে না। যা করার তাই করেছেন। আর সেটাকে সমর্থন করি না বলেই আমি চলে যাচ্ছি।

বিজয়ের কোন কথাতেই কান না দিয়ে বের হয়ে গেল সুমিত। অসহায়, অপমানিত বিজয় ওকে কি বলার চেষ্টা করেও পারলো না।

বের হয়ে গেছে সুমিত।

বিজয় এদিকের বারান্দায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

আজ এই অপমানই তার প্রাপ্য। সব হারিয়ে গেছে তার,

স্ত্রী, কন্যা মান সম্মান সব। তার সবকিছু ওই শয়তানের দল নিঃশেষে কেড়ে নিয়েছে।

রেবা চা এর কাপটা নিয়ে নামছে।

সুমিতের গলাও শুনছে। সে দেখেছে উপর থেকে সুমিত দাদাকে কি বলে বের হয়ে গেল।

রেবা সিঁড়ি থেকে নেমে টেবিলে চা এর পটটা রাখতে এসেই থমকে দাঁড়ালো। তার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে আজকের খবরের কাগজে প্রকাশিত বিকাশের সেই বড় ছবিটা।

রেবার সারা মনে ঝড় ওঠে।

তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে সেই ঝড়ের রাতের ঘটনাটা, একটা নিষ্ঠুর দৈত্য তাদের পিছনে তাড়া করেছে, মেঘের গর্জনে বিদ্যুতের ঝলকে দেখা যায় তাকে! এগিয়ে আসছে সেই শয়তান। এবার ধরে ফেলবে তাকে: কাঁপছে রেবা, দুচোখে ফুটে উঠেছে জমাট ভয়ের ছায়া। চীৎকার করে সে।

—না, না! বাঁচাও। বাঁচাও!

চমকে ওঠে বিজয়।

রেবার চোখে মুখে আতঙ্কের ছায়া। বিজয় চমকে ওঠে।

—রেবা!

রেবার ভীতিবিহ্বল প্রকম্প দেহটাকে ধরে ফেলে বিজয়।

রেবা ওই বিকাশের ছবিটাকে দেখিয়ে চীৎকার করে।

—ওই! ওই সেই শয়তান দাদা। ওই শয়তানই সেই রাতে বৌদিকে খুন করেছিল। ওই ওইটা!

চমকে ওঠে বিজয়। তার চোখের সামনে বিকাশের মুখখানা ভেসে ওঠে। ওই সেই শয়তান যে তার স্ত্রীকে শেষ করেছে। আর বিজয়কে জোর করে ওরা বাধ্য করিয়েছে কালও তাকে জেল থেকে বের করে আনতে।

তার স্ত্রীর অত্যাচারীকে সে এতদিন খুঁজেছে, কোথাও পায়নি।

আজ বিজয় বুঝতে পারে এসবই জানতো মালহোত্রার দল। তাই তারা বিজয়কে সেই অপরাধীকে ধরতে কোন সাহায্যই করেনি। উল্টে তার তদন্তকে বানচাল করে দিয়েছে।

আর আইনতঃ বিকাশকে কোন সাজাই দেওয়া সম্ভব নয় লেখাকে হত্যার অপরাধে। ওরা সব প্রমাণও লোপ করেছে।

রেবা দেখেছে দাদাকে।

দাদার মুখ চোখে ফুটে উঠেছে কি উত্তেজনার ছায়া।

—দাদা। রেবা নিজের মানসিক অবস্থাটা কিছুটা সামলে নিয়ে বিজয়কে ডাকছে।

বিজয় কি ভাবছিল বোনের ডাকে চাইল।

বলে সে—না রে। আমি ঠিক আছি।

রেবা বলে—ওই শয়তানকে সাজা দেওয়া দরকার!

তা জানে বিজয়। কিন্তু কোন আইন ওদের সাজা দিতে পারবে না।

সে কথা রেবাকে বোঝানো যাবে না।

তাই বিজয় বলে—দেখছি এবার।

রেবা বলে—তনুশ্রীও কোথায় হারিয়ে গেল, বৌদিকে চরম অপমানে ওরা মেরেছে। এসবের বিচার হবে না?

বিজয়ও ভেবেছে।

আইনকে ওরা কিনে নিলেও বিজয় আজ ওদের ছাড়বে না।

বলে সে—হবে। হবে রেবা। ওদের সকলেরই বিচার হবে। শাস্তিও হবে। ওরা কেউ পার পাবে না।

বিজয় কোর্ট থেকে ফিরে বৈকালে নিজের ঘরে উত্তেজিত ভাবে পায়চারী করছে। সারা দেহ মনে নিবিড় উত্তেজনা। সুমিতও আর আসেনি।

তাকে ভুল বুঝেই চলে গেছে। বিজয়েরও কাউকে দরকার নেই। সে আজ তার সবকিছুর মীমাংসা নিজেই করবে।

তাকে যে যা বোঝে বুঝুক, তাতে কিছু মাত্র যায় আসে না। তার জন্যই তৈরী হয় বিজয়।

রেবার কাছে তনুশ্রীর হারানোর ব্যাপারটা ও বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে। এ বাড়িতে যেন অভিশাপ লেগেছে একটার পর একটা। সব হারিয়ে যাচ্ছে।

রেবা বিজয়কে কথাটা বলতে বিজয় বলে অসহায়ের মত আমি খুঁজছিলাম তনুশ্রীকে, কিন্তু সঠিক কোন খবরই পাচ্ছিনা।

কিন্তু এবার পেয়েছি।

—তবে পুলিশকে জানাও নি কেন দাদা?

রেবার কথায় বিজয় বলে—পুলিশকে জানাতে পারিনি।

ওই শয়তানের দল আমাকে শাসিয়েছিল তাহলে মেয়েকে আর জ্যান্ত ফিরে পাবেন না।

ওদের চাপে পড়ে ওই জানোয়ার যে আমার চরম সর্বনাশ করেছে তাকেই আবার জেল থেকে বাঁচাতে হয়েছে। তবু ওরা তনুকে ছেড়ে দেয়নি।

বলে ওদের সব কেস লড়তে হবে—জিততে হবে। তবে ছাড়বে তনুকে।

রেবা শুনে চমকে ওঠে। বলে সে।

—তারপর ও ফেরৎ দেবে কি না তনুকে তার কি স্থিরতা আছে দাদা?

—তা ও নেই। বিজয় আজ অসহায় রাগে ফুলছে।

রেবা বলে—এখনও চুপ করে থাকবে? পুলিশকে জানাতে না চাও, সুমিতকে তবু বলতে পারবে। সেতো এসেছিল।

অসহায় কণ্ঠে বলে বিজয়।

—তাকে কি বলবো? সে উল্‌টে কোন কথা না শুনে আমাকে মালহোত্রাদের কেনা গোলামই বলে গেল। ভুল বুঝে গেল।

—তাই নাকি? রেবা অবাক হয়।

বিজয় বলে—তার কোনও দোষ নেই রেবা। সব দোষ আমারই, ভুল আমিই করেছি।

রেবা বলে—তাই তনুশ্রী ওই ভাবে বন্দী হয়ে থাকবে? এ হয়না দাদা। তুমি কিছু না করতে পারো আমিই সুমিতকে সব বলে এর ব্যবস্থা করবো।

বিজয় কি ভাবছে। রেবা আজ আর চুপ করে থাকবে না। সে বলে—আমি দেখছি দাদা।

বিজয় এর সামনে আজ কোন পথ নেই। সব ভাববার ক্ষমতাও যেন হারিয়ে গেছে কি কঠিন আঘাতে। আইন এখানে সাহায্য করেনি, মানুষের সাহায্যের হাত ও ওদের সুরক্ষিত প্রাসাদে পৌঁছবে না! টাকার ও অভাব নেই।

বাধ্য হয়েই ওদের কাছে নিজের ন্যায় নীতি বিবেককেও বিক্রী করে ওদের গোলাম হয়েই ওদের সব অন্যায়কে সমর্থন করে যেতে হবে।

বিজয়ের মনে হয় কি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সে ফেটে পড়ে ওদের গজদন্ত মিনারকে চুরমার করে দেবে।

হঠাৎ মিঃ মালহোত্রাকে ঢুকতে দেখে চাইল বিজয়। মিঃ মালহোত্রা, মীরচান্দানি এসেছে তার কাছে।

—নমস্কার বিজয় সাব্!

বিজয় চাইল ওদের দিকে। আজ ওদের সে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। বিজয় শুধোয়—কি ব্যাপার?

হাসছে মালহোত্রাজী, বলে সে।

—আজ আমার সুপুত্র বিকাশের জন্মদিন। আপনার চেষ্টাতেই সে ওই বিপদ থেকে খালাস পেয়েছে। তাই খুশিতে পার্টি থ্রো করেছি। আমার বন্ধু বান্ধবরাও আসবেন। আর আপনি আমাদের খুব কাছের মানুষ। তাই আপনাকে বলতে এসেছি, যদি দয়া করে যান আপনার মেয়ের সঙ্গে ও দেখা হবে। আর আমরা ও খুশি হবো।

বিজয় দেখছে ওই শয়তানদের।

ওরা ঠাণ্ডা মাথায় হিসাব করে নিজেদের স্বার্থে মানুষকে খুন করতে পারে। তার মেয়েকে আটকে রেখে উৎসব করছে, জন্মদিন পালন করছে সেই জানোয়ারটার, যে বিজয়ের সোনার সংসার তছনছ করেছে।

আর তার জন্মদিনের উৎসবে গিয়ে বিজয়কেই তাকে শুভেচ্ছা জানাতে হবে।

মালহোত্রা বলে—তাহলে আজ সন্ধ্যায় দেখা হচ্ছে ওই বাগান বাড়িতে। আসবেন কিন্তু বিকাশকে আশীর্বাদ করতে।

বিজয় বলে—ঠিক আছে।

ওরা চলে গেছে।

বিজয় ভাবছে কথাটা। একসঙ্গে ওদের চক্রের মাথা গুলোকে পাবে আজ, পাবে বিকাশকে ও। যাক এতদিন ধরে খুঁজেছে বিজয়।

কোন আইন ওদের ধরতে পারেনি। ওদের প্রতিপত্তির জন্য।

কিন্তু আইনের উর্দ্ধেও মানবিকতার অস্তিত্ব রয়ে গেছে। বিজয় আজ সেই জন্য এতবড় অন্যায় অবিচারের জবাব দেবেই। নিজের আজ সব গেছে।

বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা সহ্য করার চেয়ে প্রতিবাদের মানবিকতাকেই বিজয় আজ বড় বলে দেখে। লেখার আত্মা সুখী হবে, শান্তি পাবে।

বিজয় তাই যাবে ওখানে, তার উপর সব অন্যায়, অবিচারের জবাবই দেবে।

আজ এর শেষ করতে চায় বিজয়।

তাই মনে মনে সে ইতিকর্তব্য স্থির করেই ফেলেছে।

রেবাকে দেখে সুমিত একটু অবাক হয়।

বৈকালের আগেই বাড়ি ফিরেছে সুমিত। মীনা বলে।

—রেবা তোমার জন্য কখন থেকে বসে আছে।

সুমিত আজ ও বাড়ির সঙ্গে যেন সব সম্পর্ক ছেদই করেছে। তাই বলে—ও কেন এসেছে?

মীনা শোনায়—তুমি ক'দিন বাইরে ছিলে, ওদের বাড়ির বিপদের কথা জানো না।

সুমিত শোনায়—সকালে গেছলাম, তখন—

রেবা বলে—তখন তোমার কিছু কথা শোনার মত অবস্থাও ছিল না, দাদাকেই যা তা বলে এসেছো। কিন্তু কেন দাদাকে ওই কাজ করতে হয়েছে তাও শোননি। এক তরফা রায় দিয়েই চলে এলে।

সুমিত চাইল।

রেবার চোখে জল নামে। বলে সে।

—আজ তিন দিন ধরে তনুশ্রীকে কারা আমাদের বাগান থেকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে কোথায় আটকে রেখেছে।

—সেকি! সুমিত অবাক হয়। বলে সে।

—পুলিশকে খবর দাও নি?

রেবা বলে—তারা শাসিয়েছিল যে তনুশ্রীকে আর জ্যান্ত পাওয়া যাবে না কোনদিনই। ওই মালহোত্রার ছেলের কেস করার জন্য ওরাই তনুকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে, নাহলে ওকে মেরে ফেলবে। তাই একমাত্র মেয়েকে বাঁচাবার জন্য দাদাকে এই কাজ করতে হয়েছিল।

সুমিত এতক্ষণে বুঝতে পারে ব্যাপারটা। এতবড় বিপদে বিজয়দাকে সাহায্য না করে সে উল্টে তাকে যা তা বলে এসেছে। চরম অপবাদ দিয়েছে।

নিজেরই খারাপ লাগে সুমিতের। বলে সে।

—তাহলে এখনও মালহোত্রা তনুকে ফেরৎ দেয় নি কেন? তার দায় তো হয়ে গেছে।

রেবা বলে—ওতেও খুশী নয় ওরা। তনুকে আটকে রেখে দাদাকে

দিয়ে ওদের দলের সব কেসই করাতে চায়। নাহলে তন্নুকে তারা ছাড়বে না।

—সেকি! চমকে ওঠে সুমিত।

বলে সে—কোথায় রেখেছে তাকে?

রেবা বলে—এর বেশী কিছু জানি না সুমিত। একবার চল!

আমার খুব ভয় করছে সুমিত।

ওই খবরটা শোনার পর থেকে দাদাও বদলে গেছে।

—কোন খবর? শুধোয় সুমিত।

রেবা এবার চরম কথাটা জানায়। বলে সে।

—বৌদিকে কে খুন করেছিল জানো?

সুমিত চাইল। রেবা বলে—ওই মালহোত্রার ছেলে বিকাশই। আমি স্পষ্ট চিনেছি তাকে। কপালে কাটার দাগ। ওই শয়তানই সেই রাতে গাড়ি থেকে নেমে আমাদের উপর চড়াও হয়েছিল।

—সেকি! অবাক হয় সুমিত।

আজ বেশ বুঝেছে সমাজের, মানুষের ওই শত্রুরা কিভাবে তাদের জাল ছড়িয়ে রেখেছে। ওদের গায়ে হাত লাগবে না, ওরা সকলের সব লুটে নেবে।

বিজয়দার উপরই ঘটেছে এত অন্যায় অবিচার কোন আইন তাকে সাহায্য করতে পারবে না। লেখা বৌদির খুনীরও শাস্তি হবে না কোন দিনই।

রেবা কি ভাবছে।

সুমিত বলে—চলো। বিজয়দাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে হবে যদি ওদের কোন খোঁজ খবর মেলে। পুলিশ ফোর্স নিয়েই চড়াও হবো তাহলে।

রেবা বলে—যা ভালো বোঝো করো সুমিত। আমার মাথায় আর কিছু আসছে না।

বিজয় সুমিতকে আসতে দেখে চাইল।

বলে সে—আরও কিছু বলবে নাকি ?

সুমিত অপরাধীর মত বলে—দোষ আমারই বিজয়দা, তখন কোন কথাই শুনিনি। আপনার উপর এমনি ভাবে অত্যাচার করেছে ওরা তাও জানতাম না। আমায় মাপ করুন দাদা।

বিজয় দেখছে ওকে।

বলে সে—হ্যাঁ। যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হল সুমিত। আমাকে ভুল বুঝলেও রেবাকে ভুল বুঝোনা। ওকে দেখো।

বিজয় এর মধ্যে মনস্থির করে ফেলেছে।

আজ সে তৈরী হয়েই যাবে। সুমিত শুধোয়।

—কোথায় যাচ্ছেন ?

বিজয় হাসলো। বলে সে—জবাব দিতে। মালহোত্রার ছেলের জন্মদিন পার্টি, খুব ধুমধাম হবে। তাকে আশীর্বাদ করতে যাচ্ছি।

অবাক হয় সুমিত। বলে সে

—ওই শয়তান যে আপনার এতবড় সর্বনাশ করেছে, লেখা বৌদিকে চরম অপমান করে হত্যা করেছে তাকে আশীর্বাদ করতে যাবেন ? বিজয় হাসলো।

বলে সে—হ্যাঁ। চলি সুমিত

সুমিত তবু প্রশ্ন করে—কোথায় যাচ্ছেন ?

বিজয় জানায়—বল্লাম তো। ওর জন্মদিনের পার্টিতে। মিঃ মালহোত্রার নদীর ধারের বাগানে। চলি রেবা।

সুমিত অবাক হয়।

বিজয় বের হয়ে গেল গাড়ি নিয়ে।

রেবা বলে—সুমিত, দাদাকে যেতে দিওনা। আমার ভয় করছে সুমিত। ওকে থামাও

ততক্ষণে বিজয় বের হয়ে গেছে।

সুমিতের ব্যাপারটা ভালো লাগে না। একটা রহস্যজনক ব্যাপারই বোধ হয় তার কাছে।

সুমিত বলে—আমি দেখছি রেবা। আমিও যাচ্ছি সেখানে।

মালহোত্রার বাগান বাড়িটাকে আজ সাজানো হয়েছে। আলো জ্বলছে, রং বেরং-এর আলো। গাড়িতে করে ওই অন্ধকারের রাজ্যের তাবড় সম্রাটরা একে একে আসছে। মালহোত্রা, মীরচান্দানি, পেরেরা সকলেই রয়েছে।

হলঘরটাকে সাজানো হয়েছে। ডায়াসেও আলোর বাহার। টেবিলের উপর রয়েছে জন্মদিনের দামী কেক, ফুলের স্তূপ। কাঠের বার্ণিশকরা মেঝেতে অতিথিদের বসার জায়গা। বিদেশী বাজনার মৃদু সুর উঠছে। সারা হলঘরে আনন্দমুখর পরিবেশ গড়ে উঠেছে।

মালহোত্রা অতিথি সৎকারের কোন ত্রুটি রাখেনি। দামী স্কচের ফোয়ারা চলেছে।

বিজয়কে দেখে প্রথমে একটু অবাক হয় ওরা।

গোপালবাবু চাপা স্বরে বলে—আরে এসেছে দেখছি ব্যাটা। টাকার লোভ তো ব্যাটা ঠিক আসবে মালহোত্রাজী।

মালহোত্রা খুশি হবার ভান করে এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করে।

—আসুন বিজয়- সাব। খুব খুশী হয়েছি। আরে বিকাশ বেটা চাচাজীকে নমস্তে কর।

বিকাশও এসে নমস্কার করে বিজয়কে।

—বসুন।

বিজয় দেখছে ডায়াসের ওই মূর্তিদের।

উৎসব এর প্রথমে হাততালি, আনন্দধ্বনির মধ্যে জন্মদিনের কেট কাটছে বিজয়। বাতি জ্বলছে।

ডায়াসে মিঃ মালহোত্রা, মীরচান্দানি, পেরেরার দলও রয়েছে, ডায়াসে খুদে মহারাজার পোঁজে সিংহাসনে বসেছে বিকাশ,

অতিথিদের অনেকে সেখানে গিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, উপহারও দিচ্ছে।

বিজয়ও এবার ধীর পায়ে উঠে গিয়ে বিকাশের হাতে তুলে দেয় সুদৃশ্য একটা প্যাকেট।

মালহোত্রা রসিকতা করে—চাচাজী তোর জন্য বহুৎ কিম্মৎদার খিলোওনা নিয়ে এসেছে বেটা।

বিকাশ ও হাসছে। প্যাকেট টা খুলতেই ওর মুখের হাসি মিশিয়ে যায়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে পাহাড়ী পথে সেই ঝড় জলের রাত্রির দৃশ্যটা। অসহায় একটি মেয়ের চরম সর্বনাশ করে সে তার টুঁটি টিপে হত্যা করে ছিল।

আজ এতদিন পর এই উৎসবমুখর দিনে সেই ছবিটাকে আজ উপহার দিয়েছে বিজয়বাবুই। ওর স্ত্রী লেখার সেই হত্যার পরের ছবি।

বিকাশ আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে—না। না। আমি কিছু জানিনা। না—

এগিয়ে আসে মালহোত্রা। ওই নিষ্ঠুর হত্যার ছবি টা দেখে চটে ওঠে সে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে।

—আজ জন্মদিনে এসব কি বিশ্রী কাণ্ডের ছবি এনেছেন বিজয় বাবু? এর মানে কি?

বিজয় বলে—মানেটা আপনিও জানেন। বিকাশ ও জানে। আর এতদিন পর আমি ও জেনেছি। আমার স্ত্রীকে চরম অপমান করার পর ওই জানোয়ার তাকে খুন করেছিল।

—মিথ্যা কথা। গর্জে ওঠে মালহোত্রা। বলে সে।

—তাহলে কোর্টে যান। আইন আছে—

বিজয় বলে—আইনকে—ন্যায়নীতিকে আপনারা অনেকদিন আগেই কিনে নিয়ে তার মুখ বন্ধ করেছেন, চোখ বন্ধ করেছেন।

কিন্তু তবু সত্যকে লুকোতে পারেন নি। তা একদিন সূর্যের

আগের মত জেগে উঠেছে। আজ তাই এসেছি আমি, আইন যা পারেনি, আমি তাই করে যাবো।

—বিজয় সাব! কোথায় এ সব কথা বলছেন জানেন—

মালহোত্রা শোনায়—জিন্দা ফিরতে পারবেন না, আপনাকে—

পেরেরা পিস্তলটা হাতে আনবার আগেই বিজয় কোটের নীচে থেকে তার রিভলবার বের করে বিকাশের সামনে ধরে গর্জে ওঠে কেউ নড়লে বিকাশের জন্মদিন মৃত্যুদিনে পরিণত হবে এখুনিই। আপনিও বাদ যাবেন না। হুঁসিবার মীরচান্দানি, অমিতকে খুন করে এমনও আইনের ফাঁকে বেঁচে আছেন। আজ আর বাঁচবেন না।

ওরা চুপ করে গেছে। ভয়ে কাঁপছে বিকাশ।

বিজয় বলে—আমার মেয়েকে আনুন। এখুনিই নাহলে আপনার ছেলেকেও এখনিই শেষ করবো।

স্তব্ধতা নেমেছে হলঘরে। মালহোত্রার ইশারায় একজন দৌড়লো বিজয়বাবুর মেয়েকে আনতে। আজ বিজয়বাবু যে এমনি মরীয়া হয়ে আসবে এখানে তা বোঝেনি।

তনুশ্রীকে আনতে বিজয় এবার বের হয়ে গাড়ির দিকে যাবার পথ সাঁজছে। চারিদিকে হিংস্র জানোয়ারের দল যেন ওত পেতে আছে।

বিজয় তনুশ্রীকে নিয়ে চলেছে বিকাশকে ও ছাড়েনি।

রিভলবারের নলের মুখে ওকে রেখে সাবধানে চলেছে গাড়ির দিকে। বিকাশকে ও সে ছাড়বে না।

ওকে নিয়ে যাবে থানায়। তারপর তার হত্যার কেস-এর নোতুন করে বিচার সুরু করাবে।

জানে বিজয়, বিকাশকে ছেড়ে গেলে ওই মালহোত্রা আবার তাকে কোন ভাবে বিদেশে পাঠিয়ে দেবে। তাই এই সুযোগ ছাড়বে না সে।

মালহোত্রার সামনে দিয়ে তারই সুরক্ষিত আশ্রয় থেকে তুলে বিকাশকে নিয়ে যাচ্ছে বিজয়বাবু, তার মেয়েকেও ছিনিয়ে চলেছে তাদের হাত থেকে।

এ তাদের পক্ষে দুঃসহ লজ্জা আর অপমানের ব্যাপার।

মীরচান্দানি হঠাৎ সুযোগ পেয়েই রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়েছে, বিজয়ের দিকে। বিজয় কোনরকমে নিজেকে বাঁচিয়েছে, আবার রিভলবার তাক্ করতে দেখে এবার বিজয়ও গুলি চালিয়েছে, ছিটকে পড়ে মীরচান্দানি, মালহোত্রাও রিভলবার বের করে তার আগেই বিজয়ের গুলিতে সেও ছিটকে পড়ে।

তনুশ্রীকে দেওয়ালের ওদিকে সরিয়ে দিয়েছে, বিকাশ ও এই সুযোগে পালাবার চেষ্টা করতেই বিজয়ের গুলিতে তার ধাবমান দেহটা ছিটকে পড়ে কয়েকটা বুলেটের ঘায়ে।

এরাও গুলি চালাচ্ছে।

কোণঠাসা করে এনেছে বিজয়কে।

সারা হলে টেবিল চেয়ার কাত হয়ে পড়েছে। ভীত ত্রস্ত অতিথিরা পালাচ্ছে প্রাণ ভয়ে। পেরেরা ও দলবল নিয়ে গুলি চালাচ্ছে, আলোটা নিভে গেছে। ঝন ঝন শব্দে একটা ঝাড়বাতি পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

বিজয় তনুকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছে।

হঠাৎ সুমিত ততক্ষণে দলবল নিয়ে এসে পড়ে।

—পুলিশ।

সারা হলে আতঙ্কের ছায়া নামে।

পুলিশ এসে ওদের ঘিরে ফেলে এবার দলের বাকী নেতাদের ও এ্যারেষ্ট করে।

বিজয়কে দেখে অবাক হয় সুমিত।

রক্তাক্ত দেহ। হাঁফাচ্ছে বিজয় কি উত্তেজনায়। রিভলবারটা তখনও হাতে রয়েছে।

সুমিত বলে—একি করেছেন বিজয়দা? আপনি নিজে এইসব করেছেন?

বিজয় বলে—হ্যাঁ সুমিত।

আইন ওদের ধরতে ও পারে নি এতদিন। ওরা আইনকে ফাঁকি দিয়ে বের হয়ে যেতো। তাই বাধ্য হয়েই এই কায করতে হয়েছে।

সুমিত অবাক হয়—কিন্তু আইনের চোখে আপনিও অপরাধী।

বিজয় হাসল। বলে সে।

—তা জানি সুমিত। তাই সব দোষ স্বীকার করে পুলিশের হাতে আমি ধরা দিতে এসেছি। আমাকে এ্যারেষ্ট করো।

আদালতে সেদিন লোক ধরে না।

এমন কেস সাধারণতঃ ঘটে না। এতবড় একজন ক্রিমিন্যাল এডভোকেট যে এতদিন ওই অন্ধকারের সম্রাটদের সাহায্য করে এসেছে, সে শেষ অবধি এমনি কায করবে তা কেউ ভাবেনি।

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে আজ বিজয় সেন। এতদিন যে আদালতে দাঁড়িয়ে আইনের ফাঁক দিয়ে বহু খুনী, স্মাগলার, জঘন্য পাপীদের মুক্ত করেছে আজ সে দাঁড়িয়েছে আসামীর কাঠগড়ায়।

বিজয় বলে—ইওর অনার। আমার স্ত্রীর উপর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের অপরাধীকে আমি হত্যা করেছি, আমার বন্ধুর হত্যাকারী ওই মীরচান্দানিকেও আমি হত্যা করেছি, হত্যা করেছি ওই অন্ধকারের সাম্রাজ্যের শাহানশাহ প্রকাশ মালহোত্রাকে।

ওদের আসল পরিচয় আমি জানি।

আইন কোনদিন ওদের গায়ে হাত দিতে পারেনি, পারতো না। ওরা আইনের ফাঁক দিয়ে চিরকাল বের হয়ে গেছে। আইনকে তারা কিনে নিয়েছে। আমিও ওদের কেনা গোলাম হতে বাধ্য হয়েছিলাম।

ওরা দেশের শত্রু, মানবিকতার শত্রু। এমন কোন পথ নেই

যা দিয়ে ওদের আটকানো যেতো। তাই বাধ্য হয়েই ওই মানবিকতার শত্রুদের শেষ করেছি। আইনের চোখে আমি অপরাধী।

তাই আত্মসমর্পণ করেছি। যে শাস্তি দেবেন মেনে নোব।

তবু মুক্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাবো, সমাজের এই শত্রুদের শেষ করার জন্য নোতুন করে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

যাতে সাধারণ মানুষ শান্তিতে থাকতে পারে, ওদের টাকা যেন সেই আইনকে, সেই সমাজকে, সেই মানুষদের কিনে নিয়ে সমাজের বুকে অন্ধকারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা না করে। আমার এই প্রার্থনার আওয়াজ যেন যথাস্থানে পৌঁছায়, বিফল না হয়। যারা আইনের রক্ষক তাদের কাছে এই আমার আবেদন।

সারা আদালতে স্তব্ধতা নামে।

অগণিত মানুষের মনে এই একটি কণ্ঠস্বর যেন ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে ব্যাকুল সেই আবেদন নিয়ে।

—*—